সীসাকে সোনায় পরিণত করলেন বিজ্ঞানীরা পৃ. ২৯

ঢাকার ডেঙ্গু দমনে নতুন আশার আলো পৃ. ১৭

সৌরজগতে নতুন বামন গ্রহের সন্ধান মিলেছে পৃ. ৪৪

বিজ্ঞানবার্তা

সংখ্যা ১, ইস্যু ৩

মে ২০২৫

evoCAST
নতুন যুগের জিন সম্পাদনা

পৃ. ৩৯

সম্পাদক
তানভীর রানা রাব্বি

সহ-সম্পাদক
সাদিয়া ইসলাম

প্রচ্ছদ
চ্যাটজিপিটি, তানভীর রানা রাব্বি

প্রকাশক
বিজ্ঞানবার্তা (bigganbarta.org)
তারিখ: ২৪ জুন, ২০২৫
ইমেইল: editor@bigganbarta.org

@bigganbarta
@bigganbarta
@bigganbarta
@bigganbartafb
info@bigganbarta.org
bigganbarta.org

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞানের নতুন সব তথ্য সহজ ভাষায়, সত্য কৌতূহলের সাথে পাঠকের দরজায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা বিজ্ঞানবার্তা-র শুরু থেকেই। মে ২০২৫ সংখ্যায় আমরা তুলে ধরেছি ধলেশ্বরী নদীতে থাকা জলজ পোকার দেহের মাইক্রোপ্লাস্টিকের কথা, যা বেশ বড় চিন্তার কারণ। অন্যদিকে, নতুন যুক্ত "বিজ্ঞান ব্লগ" সেকশনে থাকছে মানুষের মস্তিষ্ক-সদৃশ প্রযুক্তি অর্গানয়েড ইন্টেলিজেন্স নিয়ে।

নিউরোসায়েন্সে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি এসেছে থ্যালামাসে চেতনার উৎপত্তি বোঝার মাধ্যমে, আর চিকিৎসায় আশার আলো জেলেছে বহু প্রজাতির সাপের বিষ প্রতিরোধে তৈরি শক্তিশালী অ্যান্টিভেনম। এছাড়া evoCAST প্রযুক্তি এসেছে অঙ্গসংস্থান রচনায় বিপ্লব ঘটাতে। মর্ডান আলকেমি আর সৌরজগতের নতুন বামুন গ্রহের কথা তো থাকছেই।

বিজ্ঞানবার্তার লক্ষ্য একটাই—বিজ্ঞানকে সহজ, জীবন্ত আর স্পর্শযোগ্য করে তোলা। জানুন, ভাবুন, প্রশ্ন করুন—এই পথেই ভবিষ্যৎ।

— সম্পাদক

তারিখ: ২৩ জুন, ২০২৫

সূচীপত্র

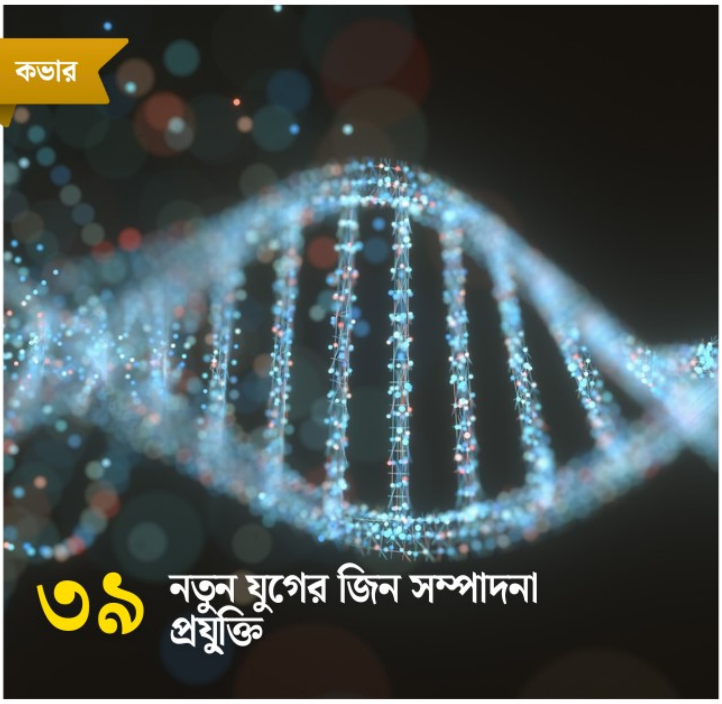

ভাইরাস

মে মাসের সেরা বিজ্ঞানচিত্র

সংবাদ

০৪ গোলাপের পাপড়িতে লুকানো গণিত
০৫ মানুষের রক্ত থেকে শক্তিশালী অ্যান্টিভেনম
০৬ নতুন এক ধরনের ক্রিস্টাল আবিষ্কার
০৭ ব্ল্যাকবেরির জিনোম সিকোয়েন্স
১০ দুশ্চিন্তা ও হতাশা বনাম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম
১১ নতুন কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি তত্ত্ব
১৬ ঘুম কম লাগে যাদের
১৭ ঢাকার ডেঙ্গু দমনে নতুন আশার আলো
১৮ জলজ পোকার দেহে মাইক্রোপ্লাস্টিক
১৯ আমরা কীভাবে মিষ্টি স্বাদ অনুভব করি?
২৪ সমুদ্রের তলদেশের কতটুকু অংশ জানি?
২৯ সীসাকে সোনায় পরিণত করলেন বিজ্ঞানীরা
৩১ হাসপাতালের জীবাণু এবার প্লাস্টিকও খাচ্ছে!
৩২ গুগলের আলফাইভলভ
৩৪ সরীসৃপ বিবর্তনের সময়রেখা পরিবর্তন
৩৮ মানুষের জিনে ইঁদুরের বড় মস্তিষ্ক
৪২ চীনের মহাকাশ স্টেশনে নতুন অণুজীব
৪৩ নক্ষত্রের চারপাশে থাকা ডিস্কে বরফের সন্ধান!
৪৪ সৌরজগতে নতুন বামন গ্রহের সন্ধান
৪৬ স্পাইডার পালসার ও তার হিলিয়াম সঙ্গীর রহস্য
৪৮ প্রথম পার্সোনালাইজড CRISPR থেরাপি
৫৩ কাপ্তাই হ্রদে নতুন প্রজাতির আইড় মাছ

মতামত

২৫ উন্নত বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যাচ্ছে স্কুলে, আমরা কি প্রস্তুত?

বিজ্ঞান ব্লগ

১৩ অর্গানয়েড ইন্টেলিজেন্স
২১ দৃষ্টিবিভ্রমের নীল

ফিচার

২৭ অ্যান্টার্কটিকায় বরফ বেড়েছে?
৫০ পৃথিবীর কক্ষপথে কয়টি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করছে?

গণিত

গোলাপের পাপড়িতে লুকানো গণিতের জাদু

জ্যামিতির এক অজানা কৌশল কীভাবে গড়ে তোলে পাপড়ির রোল-করা প্রান্ত আর ধারালো কোণ।

bibi57/Getty

গোলাপের পাপড়ি যেমনটা দেখতে সুন্দর, তেমনি এর বেড়ে ওঠার পেছনে লুকিয়ে আছে জটিল গণিত। পদার্থবিদদের একদল গবেষক সম্প্রতি দেখিয়েছেন, পাপড়ির গঠন নির্ভর করে এমন এক ধরনের জ্যামিতিক কৌশলের ওপর—যা এর আগে প্রকৃতিতে দেখা যায়নি। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, কম্পিউটার সিমুলেশন এবং নমনীয় প্লাস্টিক শিট নিয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা দেখেছেন, যখন পাপড়িগুলো বাইরের দিকে গুটিয়ে যায়, তখন মেকানিকাল ফিডব্যাক তার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে পাপড়ির কিনারায় গড়ানো প্রান্ত ও কোণাকৃতি ধার তৈরি হয়।

এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে গত ১ মে, ২০২৫ *Science* জার্নালে। গবেষকরা মনে করছেন, ভবিষ্যতে এই জ্যামিতি স্থাপত্যবিদ্যায় নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলতে পারে।

জ্যামিতিক নকশা যে জীবের বিকাশে প্রভাব ফেলে, তা অনেক আগে থেকেই জানা। তবে আগে যত গবেষণা হয়েছে, সবক্ষেত্রেই বিষয়টি ছিল পৃষ্ঠের ইন্ট্রিনসিক (intrinsic) জ্যামিতির ওপর ভিত্তি করে। ইন্ট্রিনসিক বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় পৃষ্ঠের যেকোনো দুইটি বিন্দুর মধ্যকার দূরত্ব।

কিন্তু একই ইন্ট্রিনসিক জ্যামিতি থাকা সত্ত্বেও একটি পৃষ্ঠ অনেকভাবে ত্রিমাত্রিক জগতে অস্তিত্ব রাখতে পারে—এগুলোকে বলে এক্সট্রিনসিক (extrinsic) জ্যামিতি। যেমন, একটি কাগজের পাতাকে একদম সমানভাবে বিছানোও যায়, আবার সেটিকে গোল করে সিলিন্ডারের মতোও মোড়ানো যায়। এতে ঐ কাগজের পৃষ্ঠের পিঠে হাঁটতে থাকা একটি পিঁপড়া তার হাঁটার দূরত্বে কোনো পার্থক্য বুঝবে না কিন্তু ত্রিমাত্রিক জায়গায় কাগজের ভাঁজে থাকা বিন্দুগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব ঠিকই বদলে যাবে বা যেতে পারে।

একটি প্রকৃতিগতভাবে বাঁকা পৃষ্ঠকে সমানভাবে বিছাতে গেলে সেটিকে টানতে হয়, যা সেই পৃষ্ঠের ভেতরে চাপ বা স্ট্রেস তৈরি করে।

"গোলাপের পাপড়ি অভ্যন্তরীণভাবে একটি সমতল পৃষ্ঠ হিসেবে গঠন পেতে চায়, কিন্তু বাহ্যিকভাবে এটি সিলিন্ডারের মতো বাঁকতে চায়"

জীবন্ত টিস্যুতে এই চাপ অন্য অনেক জৈবিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। ধরুন, একটি পাতার এমনভাবে বেড়ে ওঠার প্রবণতা আছে যাতে এটি বাঁকিয়ে গেলে শক্তি খরচ কম হয়। কিন্তু যদি পাতাটি মোটা হয় বা এর আলাদা স্তর ভিন্নভাবে বাঁকতে চায়, তাহলে ওই প্রাকৃতিক বাঁকানোর পথ ব্যাহত হয়। এই ধরনের বৈপরীত্য বা 'অসমতা' (incompatibility) প্রকৃতিতে দেখা যায় এবং এর ফলে জটিল গঠন ও শক্তিশালী পৃষ্ঠ তৈরি হয়।

গবেষকেরা দেখেছেন একটি গোলাপের পাপড়ির বেড়ে ওঠার আকার নির্ভর করে এক নতুন ধরনের অসামঞ্জস্যতার ওপর, যা ইন্ট্রিনসিক নয়, বরং এক্সট্রিনসিক জ্যামিতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

গবেষণায় আরো দেখা গেছে, গোলাপের পাপড়ি অভ্যন্তরীণভাবে একটি সমতল পৃষ্ঠ হিসেবে গঠন পেতে চায়, কিন্তু বাহ্যিকভাবে এটি সিলিন্ডারের মতো বাঁকতে চায়। পুরো কিনারাটি একটানা সিলিন্ডারের মতো বাঁকতে না পারায়, এটি একাধিক সিলিন্ডার আকৃতির অংশে ভেঙে যায় এবং প্রতিটি অংশের মাঝে তৈরি হয় তীক্ষ্ণ কোণ বা 'কাস্প'। অর্থাৎ প্রতিটি

সিলিন্ডার অংশ একত্রে মিলিত হয় কাস্পে। পাপড়ি যত বাড়ে, প্রতিটি কাস্পে জমে থাকা চাপ গোল প্রান্তকে ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ কোণে রূপান্তরিত করে দেয়।

এই আকৃতিগত গঠন গোলাপের জন্য কোনো প্র্যাক্টিক্যাল সুবিধা এনে দেয় কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে সম্ভবত এটি বেশি পরাগবাহী পতঙ্গ আকর্ষণ করতে, শিশির জমাতে বা ফুলের কাঠামোগত শক্তি বাড়াতে সহায়তা করে থাকতে পারে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা।

লেখক: সায়মা ইয়ানা

রেফারেন্স: *DOI: [10.1126/science.adt0672](https://doi.org/10.1126/science.adt0672)*

স্বাস্থ্য

মানুষের রক্ত থেকে শক্তিশালী অ্যান্টিভেনম

প্রায় ২০০ বার বিষাক্ত সাপের কামড় খেয়েছেন এমন একজন ব্যক্তির রক্তের অ্যান্টিবডি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা একটি শক্তিশালী অ্যান্টিভেনম তৈরি করেছেন। এই অ্যান্টিভেনম ১৯টি প্রাণঘাতী সাপের বিষের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে সক্ষম। গবেষকরা বলছেন, এটি ভবিষ্যতের উন্নত ও কার্যকর অ্যান্টিভেনম তৈরির পথ দেখাতে পারে।

বিজ্ঞানীরা একটি শক্তিশালী অ্যান্টিভেনম তৈরি করেছেন। অ্যান্টিভেনমটি এক ব্যক্তির রক্তে থাকা অ্যান্টিবডি ব্যবহার করে বানানো হয়েছে যিনি বহুবার বিষাক্ত সাপের কামড় খেয়েছেন। এই অ্যান্টিভেনম ১৯টি প্রাণঘাতী সাপের বিষের বিরুদ্ধে ইঁদুরকে সুরক্ষা দিতে সক্ষম, যার মধ্যে কিং কোবরা (*Ophiophagus hannah*) ও রয়েছে।

এই অ্যান্টিভেনমে মিশ্রিত করা হয়েছে ভ্যারেসপ্লাডিব (varespladib) নামের একটি ঔষধ এবং টিম ফ্রিডে নামের এক মার্কিন সাপ সংগ্রাহকের রক্ত থেকে সংগৃহীত অ্যান্টিবডির কপি। ফ্রিডে নিজেকে ৬০০ বারের বেশি সাপের বিষ দিয়েছেন এবং প্রায় ২০০ বার বিষাক্ত সাপের কামড় খেয়েছেন নিজ ইচ্ছায়। মে, ২০২৫ এ *Cell* জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় এই অ্যান্টিভেনমের কথা জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই গবেষণা বহু প্রতীক্ষিত চিকিৎসার পথ খুলে দিতে পারে, তবে যেহেতু এটি একজন ব্যক্তির আত্ম-পরীক্ষার ওপর নির্ভর করে তৈরি, তাই এর নৈতিকতা প্রশ্নের মুখে। গবেষণাকরা বলছেন, তারা ফ্রিডেকে এভাবে বিষ প্রয়োগে উৎসাহিত করেননি। গবেষক জ্যাকব গ্লানভিল, বায়োমেডিকেল কোম্পানি Centivax-এর সিইও, বলেন, "আমরা ফ্রিডেকে এভাবে কিছু করার পরামর্শ দিইনি এবং ভবিষ্যতে আর কাউকে এটি করতেও হবে না কারণ আমাদের প্রয়োজনীয় সব অণু এখন আমাদের হাতে রয়েছে।" তিনি আরও সতর্ক করেন: "সাপের বিষ বিপজ্জনক, কেউ ফ্রিডের পথ অনুসরণ করবেন না।"

বর্তমানে ব্যবহৃত অ্যান্টিভেনম তৈরি হয় ঘোড়া বা অন্যান্য প্রাণীর শরীরে সাপের বিষ প্রয়োগ করে, তারপর তাদের শরীর থেকে অ্যান্টিবডি সংগ্রহ করে। প্রতিটি অ্যান্টিভেনম সাধারণত গুটিকয়েক প্রজাতির সাপের বিরুদ্ধেই কাজ করে।

এই গবেষণায় লক্ষ্য ছিল এমন একটি অ্যান্টিভেনম তৈরি করা যা বিশ্বের ৬০০+ বিষাক্ত সাপের বিস্তৃত পরিসরের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে। প্রথম ধাপে তারা Elapidae পরিবারের সাপ নিয়ে কাজ শুরু করে, যার মধ্যে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক বিষধর সাপ রয়েছে। এই সাপের বিষে থাকে SNX (short-chain neurotoxins) ও LNX (long-chain neurotoxins) নামের পেপটাইড, যেগুলো স্নায়ুকোষে সংবেদী রিসেপ্টরে আটকে স্নায়ুর কার্যকারিতা ও পেশীর নড়াচড়া বন্ধ করে দিতে পারে।

গ্লানভিল ও আরেক গবেষক নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট, পিটার কোয়াং, সংবাদমাধ্যমে ফ্রিডের আত্ম-পরীক্ষার খবর দেখে আগ্রহী হন। ফ্রিডের সম্মতি ও সাপের বিষের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করে তারা তাঁর রক্ত সংগ্রহ করে। দুইটি রক্তের নমুনা থেকে অ্যান্টিবডি আলাদা করে গবেষণাগারে ইঁদুরে পরীক্ষা চালানো হয়। পরে এতে যোগ করা হয় ভ্যারেসপ্লাডিব, একটি ওষুধ যা সাপের

বিষে থাকা এনজাইম নষ্ট করে পেশী ও স্নায়ু ধ্বংস প্রতিরোধ করে।

তারা দেখতে পান, ফ্রিডের রক্ত থেকে নেওয়া দুটি অ্যান্টিবডি ও ভ্যারেসপ্লাডিবের সংমিশ্রণে তৈরি ককটেল ইঁদুরকে ১৯টি ভিন্ন ধরনের বিষাক্ত Elapid সাপের মারাত্মক বিষ থেকেও বাঁচাতে পারে। একটি অ্যান্টিবডি LNX বিষের সাধারণ বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করে, অন্যটি SNX বিষের।

গ্লানভিল বলেন, মানুষের অ্যান্টিবডির সঠিক কপি প্রাণীর উপর ভিত্তি করে তৈরি অ্যান্টিবডির তুলনায় কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে।

সুনাগারসহ অনেক বিজ্ঞানী এই গবেষণার নৈতিকতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও তারা গবেষণাটিকে কার্যকরভাবে পরিচালিত বলেও স্বীকার করেন। তিনি বলেন, ছোট অণুর ওষুধ (যেমন ভ্যারেসপ্লাডিব) ও মানব অ্যান্টিবডির সংমিশ্রণ আশা জাগায়। তবে এই অ্যান্টিবডি শিল্প পর্যায়ে উৎপাদন করা যাবে কিনা এবং তা সাশ্রয়ী হবে কিনা, সেটাই প্রশ্ন।

ফরাসি গবেষণা প্রতিষ্ঠান IRD-র ভেনম বিশেষজ্ঞ জঁ্য-ফিলিপ শিপো বলেন, সাপের কামড়ের প্রধান সমস্যা অ্যান্টিভেনম নয়, বরং সেটি দেরিতে প্রয়োগ করা। “আমাদের ভাবতে হবে কীভাবে অ্যান্টিভেনম আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায়, যেখানে বিষাক্ত সাপের কামড় বেশি ঘটে, এবং রোগীদের দ্রুত হাসপাতালে আসতে উৎসাহিত করতে হবে,” বলেন তিনি। “এই নতুন অ্যান্টিবডিগুলো তা আদৌ পারবে কিনা, বলা কঠিন।”

গ্লানভিল বলেন, তিনি এই অ্যান্টিভেনমকে আরও বহনযোগ্য ও সাশ্রয়ী করার উপায় ভাবছেন। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, মানুষের ওপর পরীক্ষা শুরু করার আগে বাস্তব জগতে এই ককটেল কাজ করে তা প্রমাণ করতে হবে।

Centivax কোম্পানি প্রথমে অস্ট্রেলিয়ায় সাপে কামড়ানো কুকুরের ওপর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করতে চায়। প্রয়োগের পর কিছু সময়ের মধ্যে যদি কাজ না করে, তাহলে ঐ কুকুরকে প্রচলিত অ্যান্টিভেনম দেওয়া হবে।

লেখক: ফারিহা রহমান পারু

রেফারেন্স: DOI: 10.1016/j.cell.2025.03.050

ন্যানো প্রযুক্তি

নতুন এক ধরনের ক্রিস্টাল আবিষ্কার

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এক নতুন ধরনের দণ্ডাকৃতির ক্রিস্টাল আবিষ্কার করেছেন, যার ভেতরে ফাঁপা চ্যানেল রয়েছে। “ঝ্যাংগেনাইট” নামের নতুন এই ক্রিস্টাল, ক্রিস্টাল গঠনের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করছে।

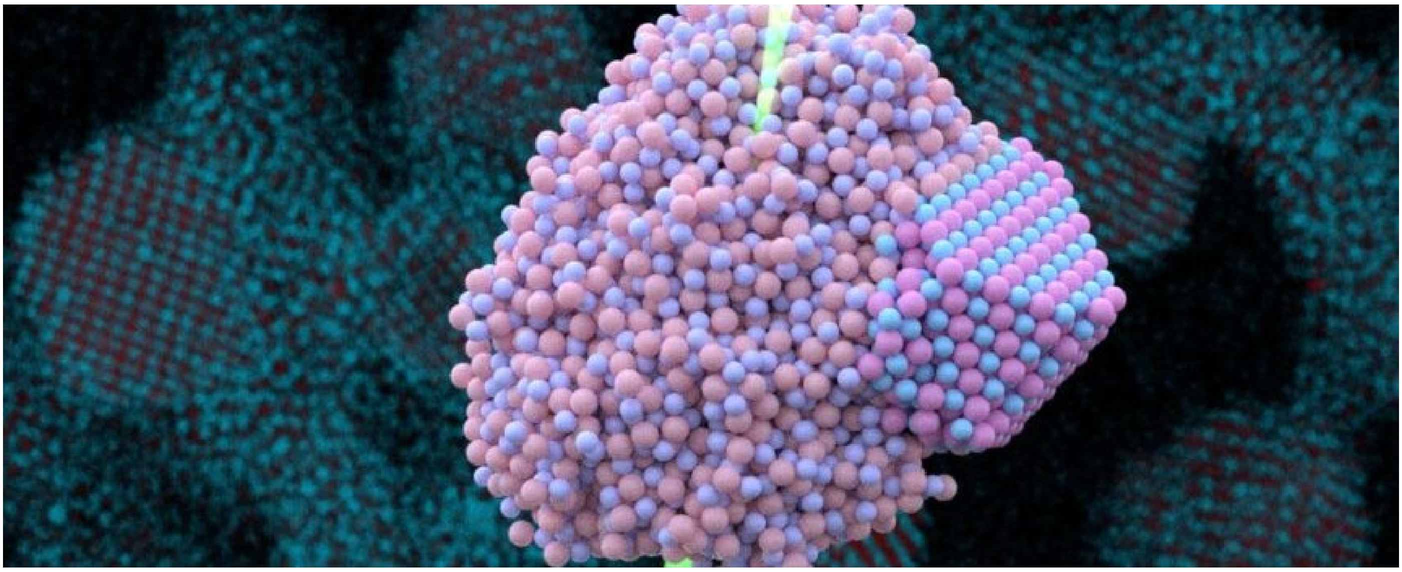

Shihao Zang

ক্রিস্টাল কীভাবে গঠিত হয় তা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটি অদ্ভুত, দণ্ডাকৃতির (rod-shaped) ক্রিস্টাল বা স্ফটিকের সন্ধান পেয়েছেন যা আগে কখনও শনাক্ত করা হয়নি। স্ফটিক গঠনের বর্তমান ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, এই নতুন আবিষ্কারটি ভেতর থেকে ভিন্ন গঠনের সম্পূর্ণ নতুন ধরনের স্ফটিক উন্মোচন করেছে, যা ম্যাটারিয়াল সায়েন্সের নতুন উদ্ভাবনের পথ খুলে দিতে পারে।

স্ফটিক বা ক্রিস্টাল হচ্ছে এমন কঠিন পদার্থ যেগুলোর কণাগুলো নির্দিষ্ট পুনরাবৃত্তিমূলক ধাঁচে সাজানো থাকে। এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল, এ ধরনের স্ফটিক ধাপে ধাপে এবং পূর্বানুমানযোগ্য উপায়ে গঠিত হয়। কিন্তু এই নতুন গবেষণা বলছে, পুরো প্রক্রিয়াটি অনেক বেশি জটিল হতে পারে।

গবেষকরা "কলোইডাল পার্টিকেল" নামক অতিক্ষুদ্র গোলাকার কণার সাহায্যে স্ফটিক গঠনের প্রক্রিয়া বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই কণিকাগুলো সাধারণ পরমাণুর তুলনায় অনেক বড়, যার ফলে গবেষকরা এর স্ফটিক গঠন পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছেন।

"আবিষ্কর্তা ঝাং-এর নামে এটি আনঅফিশিয়ালি "ঝ্যাংগেনাইট" নামে পরিচিতি দেয়া হচ্ছে"

গবেষণায় দেখা গেছে, লবণপানিতে চার্জযুক্ত এই কণাগুলোর আচরণ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা এবং হাজার হাজার কম্পিউটার সিমুলেশন চালানোর মাধ্যমে, স্ফটিক গঠনের একটি দ্বি-পর্যায়ের প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথমে কণাগুলো এলোমেলো, অগঠিত গুচ্ছে (amorphous blobs) পরিণত হয়, যা পরবর্তীতে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল গঠনে রূপান্তরিত হয়। এই পদ্ধতিতে একাধিক ধরনের স্ফটিক তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে একটি ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

পিএইচডি শিক্ষার্থী শিহাও ঝাং একটি পরীক্ষার সময় দুর্ঘটনাবশত একটি দণ্ডাকৃতির স্ফটিক আবিষ্কার করেন। এটি দেখতে পূর্বপরিচিত এক ধরনের স্ফটিকের মতো হলেও বিশ্লেষণে দেখা যায় ভেতরে ফাঁপা চ্যানেল বা পথ রয়েছে—যা একে ভিন্ন করে তোলে।

প্রাকৃতিকভাবে পরিচিত হাজারেরও বেশি স্ফটিকের সাথে এই স্ফটিকটির গঠন মিল না পাওয়ায়, ঝাং কম্পিউটার সিমুলেশনের সাহায্য নেন, যা নিশ্চিত করে যে এটি সত্যিই একটি নতুন ধরনের স্ফটিক। গবেষণার সহকর্মী ড. গ্লেন হকি বলেন, "এটি খুব বিস্ময়কর ছিল, কারণ সাধারণত স্ফটিকগুলো ঘন হয়, কিন্তু এটিতে ফাঁপা চ্যানেল ছিল।"

এই স্ফটিকটির নাম রাখা হয়েছে L3S4, তবে আবিষ্কর্তা ঝাং-এর নামে এটি আনঅফিশিয়ালি "ঝ্যাংগেনাইট" (Zangenite) নামে পরিচিতি দেয়া হচ্ছে।

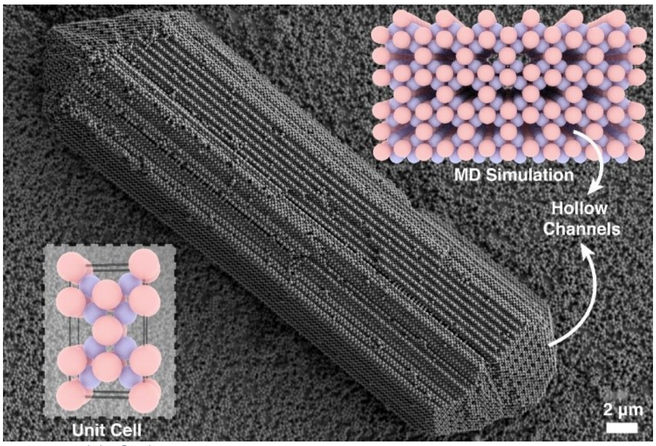

ঝ্যাংগেনাইট ক্রিস্টালের কাঠামো (Shihao Zang)

এটি শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিষয়ই নয়—ঝ্যাংগেনাইট বাস্তব ব্যবহারেও উপকারী হতে পারে। এর ফাঁপা ও নিম্ন-ঘনত্বের গঠন সেইসব উপাদানের মতো, যেগুলো পরিশোধন (filtration) বা আবরণ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ড. হকি বলেন, "ঝ্যাংগেনাইটের ভেতরের চ্যানেলগুলো পদার্থ আটকে রাখা বা পরিশোধনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।"

এই আবিষ্কার স্ফটিক গঠনের ব্যাপারে প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে এবং ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এমন আরও নতুন ধরনের গঠন হয়তো পৃথিবীতে লুকিয়ে আছে।

লেখক: নুজহাত সুবাহ ঐশী

রেফারেন্স: *DOI: [10.1038/s41467-025-58959-0](https://doi.org/10.1038/s41467-025-58959-0)*

ভাইরাস

DrPixel/iStock

ভাইরাস হলো জীবনহীন, অতি ক্ষুদ্র একধরনের জীবাণু যা জীবন্ত প্রাণীর শরীরে সংক্রমণ ঘটায়। ভাইরাসের নিজস্ব কোনো কোষ বা বিপাকক্রিয়া (মেটাবলিজম) নেই। ভাইরাস তাদের নিজস্ব জিনগত উপাদান জীবন্ত কোষের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে কোষকে তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করে। ফলে, কোষ তার নিজের কাজ না করে ভাইরাসের ডিএনএ বা আরএনএ অনুযায়ী নতুন ভাইরাস তৈরি করতে শুরু করে।

ভাইরাস পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি জীবেই সংক্রমণ ঘটাতে পারে। এমনকি ব্যাকটেরিয়াও ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। মানুষের ভাইরাসজনিত রোগগুলোর মধ্যে রয়েছে হামের মতো রোগ, ফ্লু, কোভিড-১৯ এবং সাধারণ সর্দি-কাশি সহ আরো অনেক।

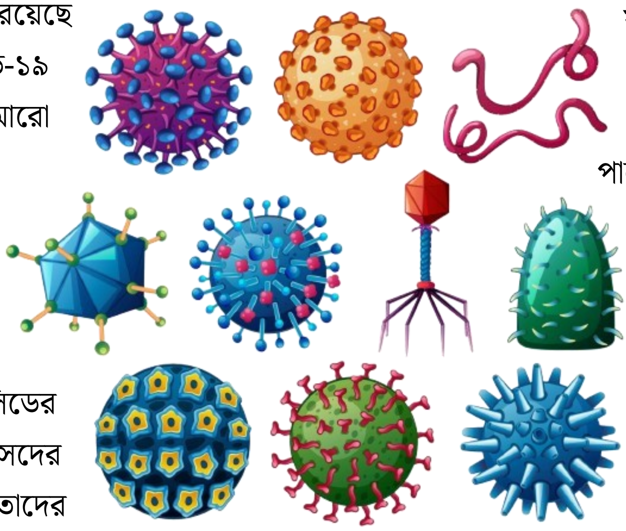

সব ভাইরাসেই ডিএনএ বা আরএনএ জাতীয় জিনগত উপাদান থাকে, যা একটি প্রোটিনের খোলস বা ক্যাপসিডের ভিতরে আবদ্ধ থাকে। তবে ভাইরাসদের আরও কিছু "সরঞ্জাম" থাকে যা তাদের কোষে সংক্রমণ ঘটাতে সাহায্য করে। কিছু ভাইরাসে লোহার মতো ধারালো কাঁটা থাকে যা ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে ছিদ্র করতে পারে। কিছু ভাইরাসের বাইরের একটি স্তর থাকে যা কোষের মেমব্রেনের মতো দেখতে — এদের "এনভেলপড ভাইরাস" বলা হয়। কোভিড-১৯ রোগের জন্য দায়ী SARS-CoV-2 ভাইরাস এমনই একটি উদাহরণ।

ভাইরাসের আকৃতিও বিচিত্র হয়। যেমন, ব্যাকটেরিয়াকে সংক্রমণ করে এমন এক ধরনের ভাইরাস, ব্যাকটেরিওফাজ, দেখতে ছয় পায়ের পোকামাকড়ের মতো। গাছপালায় সংক্রমণ ঘটানো টোব্যাকো মজাইক ভাইরাস দেখতে লম্বাটে নলের মতো।

কিছু বিজ্ঞানীর মতে, ভাইরাস জীবিত নয়, কারণ তারা নিজেরা নিজেরা বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। কিন্তু ভাইরাসের কিছু বৈশিষ্ট্য জীবন্ত প্রাণীর মতোই। যেমন, ভাইরাস সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত বা বিবর্তিত হয়। ভাইরাসের ডিএনএ বা আরএনএ-তে হঠাৎ পরিবর্তন বা মিউটেশন হলে এটি ঘটে। আবার, যখন দুটি ভাইরাস একই কোষে সংক্রমণ ঘটায়, তখন তারা তাদের জিনগত উপাদান বিনিময় করতে পারে। এই মিশ্রণ থেকে একধরনের নতুন ভাইরাস জন্ম নিতে পারে যার মধ্যে ওষুধ বা ভ্যাকসিন প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকতে পারে।

এই কারণেই প্রতিবছর ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়া জরুরি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফ্লু ভাইরাস নিজেদের জিন বদলে নতুন রূপ নেয়। তাই আগের বছরের টিকা এ বছরের ভাইরাস থেকে সুরক্ষা দিতে নাও পারে।

মজার ব্যাপার হলো, HearNPV নামের একটি ভাইরাস শুঁয়োপোকাদের আচরণ বদলে দেয়, যার ফলে তাদের শিকারির হাতে পড়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

লেখক: সুমাইয়া আক্তার রিয়া

জেনেটিক্স

ব্ল্যাকবেরির জিনোম সিকোয়েন্স

ব্ল্যাকবেরি তার গাঢ় রঙ ও মিষ্টি-টক স্বাদের জন্য পরিচিত। চিরকালই বেরি প্রেমীদের পছন্দের তালিকায় থাকে ব্ল্যাকবেরি। এখন একটি নতুন জিনোম গবেষণা এই ফলটির জিনগত রহস্য উন্মোচন করছে, যা ব্ল্যাকবেরি চাষে বিপ্লব ঘটাতে পারে এবং কৃষক ও ভোক্তা—উভয়ের কাছেই এর জনপ্রিয়তা আরও বাড়াতে পারে।

Lin Animalart

Rosaceae গোত্রভুক্ত *Rubus* গণের অন্তর্গত ব্ল্যাকবেরি শুধু স্বাদের জন্যই নয়, এর স্বাস্থ্যগুণের জন্যও সমাদৃত। এতে থাকা অ্যান্থোসায়ানিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ডায়েটারি ফাইবার একে একটি পুষ্টিগুণে ভরপুর ফল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব গুণাবলি ও ভোক্তাদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ গত দুই দশকে এর বাজার মূল্য ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ব্ল্যাকবেরি হলো চতুর্থ সর্বাধিক অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বেরি ফসল। ২০১৭ সালেই দেশটি ১৮,০০০ মেট্রিক টনের বেশি প্রক্রিয়াজাত ও তাজা ব্ল্যাকবেরি উৎপাদন করেছে। চাহিদা মেটাতে আমদানিও বেড়েছে; ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ১,২২,০০০ মেট্রিক টন তাজা ও ১৬,০০০ মেট্রিক টন হিমায়িত ব্ল্যাকবেরি আমদানি করেছে, যার সম্মিলিত বাজারমূল্য ছিল ৫৬২ মিলিয়ন ডলার।

বিশ্বব্যাপী ব্ল্যাকবেরি উৎপাদন বছরে ৯ লাখ মেট্রিক টন ছাড়িয়ে গেছে, যা আন্তর্জাতিক বেরি শিল্পে এর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নির্দেশ করে। এই সম্প্রসারণের মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে উন্নত স্বাদ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সংরক্ষণযোগ্যতা সম্পন্ন নতুন জাত উদ্ভাবনের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা।

এই প্রচেষ্টায় একটি বড় সাফল্য এসেছে *Horticulture Research*-এ প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে, যা পরিচালনা করেছেন ড. ঝানাও দেং। তাঁর দল একটি টেট্রাপ্লয়েড ব্ল্যাকবেরি জাত—BL1-এর সম্পূর্ণ জিনোম সফলভাবে সিকোয়েন্স করেছে। র‍্যাসবেরির মতো ডাইপ্লয়েড উদ্ভিদের তুলনায় BL1-এ প্রতিটি ক্রোমোজোমের চারটি করে কপি রয়েছে, যা জিনগত গবেষণাকে করে তুলেছে জটিল, তবে সম্ভাবনাময়।

"টেট্রাপ্লয়েড নিয়ে কাজ করা ডাইপ্লয়েডের তুলনায় অনেক বেশি জটিল," বলেন ড. দেং, "তবে এই টেট্রাপ্লয়েড ব্ল্যাকবেরির জিনোম প্রকাশ ভবিষ্যতের জাত উন্নয়নে নির্ভুল ও কার্যকর পদ্ধতি তৈরি করতে সহায়ক হবে।" এই রেফারেন্স জিনোম ব্যবহার করে এখন রোগ প্রতিরোধী, উন্নত মানের

ফল ও কাঁটাহীন ডাঁটা সম্পন্ন ব্ল্যাকবেরি জাত চাষ করা সম্ভব হবে।

"টেট্রাপ্লয়েড ব্ল্যাকবেরি জাত BL1-এর সম্পূর্ণ জিনোম সফলভাবে সিকোয়েন্স করেছে বিজ্ঞানীরা"

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই জিনোম বিশ্লেষণ অ্যান্থোসায়ানিন নামক রঞ্জক পদার্থের জৈব সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সম্পর্কেও তথ্য দিচ্ছে—যা ফলটির উজ্জ্বল রঙ ও স্বাস্থ্যগুণের জন্য দায়ী। এর মাধ্যমে ভবিষ্যতের জাতগুলোতে এই গুণাবলি আরও বাড়ানো সম্ভব হতে পারে, ফলে ফলগুলো হয়ে উঠবে আরও আকর্ষণীয় ও পুষ্টিকর।

"এই গবেষণা কেবল ব্ল্যাকবেরির জিনতত্ত্বের উপর আমাদের জ্ঞান বাড়ায়নি, বরং এটি এমন এক ভিত্তি তৈরি করেছে যার মাধ্যমে সারা বিশ্বের কৃষক ও ভোক্তারা উন্নত জাতের সুফল ভোগ করতে পারবেন।" বলেন ড. দেং।

লেখক: ইসরাত জাহান

রেফারেন্স: *DOI: 10.1093/hr/uhaf052*

স্বাস্থ্য

দুশ্চিন্তা ও হতাশা বনাম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে

হাজার হাজার কিশোর-কিশোরীর ওপর করা এক জরিপে দেখা গেছে, যেসব তরুণ মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে তারা সাধারণত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশি সময় কাটায়, কিন্তু সেখানে তাদের অভিজ্ঞতা অন্যদের তুলনায় কম সন্তোষজনক।

যুক্তরাজ্যের ৩,৩৪০ কিশোর-কিশোরীর ওপর করা এক জরিপে দেখা গেছে, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্ত কিশোররা প্রতিদিন গড়ে ৫০ মিনিট বেশি সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কাটায়। এছাড়াও, তারা নিজের অনলাইন বন্ধুদের সংখ্যা বা প্ল্যাটফর্মে তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি অসন্তুষ্ট।

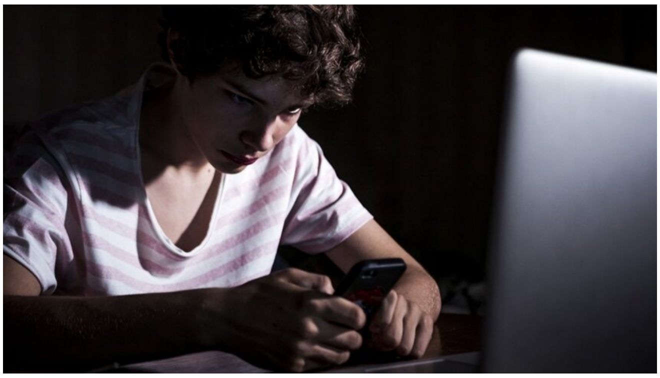

mikeshots/Depositphotos

গত ৫ মে, ২০২৫ এ *Nature Human Behaviour* জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, মানসিক সমস্যার ভিন্নতা অনুযায়ী কিশোররা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কীভাবে সময় কাটায়, তা ভিন্ন হয়ে থাকে। যেসব কিশোর উদ্বেগ বা হতাশার মতো 'ইন্টারনালাইজিং' (নিজের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব) সমস্যায় ভোগে, তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্যদের তুলনায় বেশি নেতিবাচক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। অন্যদিকে, ADHD-এর মতো 'এক্সটারনালাইজিং' (অন্যদের প্রতি নেতিবাচক আচরণ) সমস্যা যাদের আছে, তাদের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম।

গবেষক লুইসা ফাসি, যিনি ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজের তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার নিয়ে কাজ করেন, বলেন, "এ ধরনের বড় পরিসরের ওপর করা গবেষণা খুবই বিরল।"

"এক্সটারনালাইজিং সমস্যা যাদের আছে, তাদের প্রভাব তুলনামূলকভাবে কম"

নিউ ইয়র্ক সিটির কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির শিশু ও কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ অ্যান মেরি আলবানো বলেন, "এই ফলাফল পরিবারগুলোর জন্য সতর্ক সংকেত। যদি আপনার সন্তানের উদ্বেগ বা হতাশার প্রবণতা থাকে, তাহলে সামাজিক মাধ্যমে তাদের সময় কাটানো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত।"

অনলাইনে আচরণ ও প্রতিক্রিয়া

গবেষকরা ২০১৭ সালে যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস (NHS) পরিচালিত ১১ থেকে ১৯ বছর বয়সী তরুণদের এক জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করেন। এতে অংশগ্রহণকারীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়ন করা হয় এবং তাদের সামাজিক মাধ্যমে সময় কাটানো ও অনুভূতির বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন করা হয়।

প্রায় ১৬ শতাংশ উত্তরদাতা অন্তত এক ধরনের মানসিক সমস্যায় ভুগছিল। এর মধ্যে ৮ শতাংশের ছিল ইন্টারনালাইজিং সমস্যা (যেমন: অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন) এবং ৩ শতাংশের ছিল এক্সটারনালাইজিং সমস্যা (যেমন: ADHD)।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত কিশোররা মোটের ওপর সামাজিক মাধ্যমে বেশি সময় কাটায়। বিশেষ করে ইন্টারনালাইজিং সমস্যায় ভোগা কিশোররা অন্যদের সঙ্গে নিজেদের বেশি তুলনা করে এবং পোস্টের কমেন্ট বা রিঅ্যাকশন দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। তারা নিজেদের সময় নিয়ন্ত্রণ করতেও কম সক্ষম।

ভবিষ্যৎ করণীয়

এই ফলাফল মানসিক স্বাস্থ্য চিকিৎসকদের জন্য উপকারী হতে পারে, বিশেষ করে কিশোরদের ভিন্নধর্মী সমস্যার নিরাময়ে। লুইসা ফাসি বলেন, “তারা এই তথ্য ব্যবহার করে সামাজিক মাধ্যমে সময় নিয়ন্ত্রণ বা অন্যদের সঙ্গে তুলনা কমানোর মতো কৌশল শেখাতে পারে।”

অ্যান মেরি আলবানো বলেন, “আমরা সামাজিক মাধ্যম-সচেতনতা নিয়ে অনেক কাজ করি। আমাদের সমাজভীতি সমস্যায় (social anxiety disorder) আক্রান্ত কিশোরদের শেখাই কীভাবে মেসেজিংয়ের জবাব দিতে হয়, কোন সাইটগুলো তাদের আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং কোনগুলো থেকে বিরত থাকা ভালো।”

তবে ফাসি মনে করিয়ে দেন, এই গবেষণায় সামাজিক মাধ্যম কিশোরদের মানসিক সমস্যা সৃষ্টি করে কি না, সেটি বলা যায় না — এটি এখনো গবেষণার বিষয়। এর উত্তর পেতে হলে দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা বা নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে নিরীক্ষামূলক গবেষণা প্রয়োজন।

লেখক: নুসাইবা জামান এশা

রেফারেন্স: DOI: 10.1038/s41562-025-02134-4

পদার্থবিজ্ঞান

নতুন কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি তত্ত্বের প্রস্তাব

ফিনল্যান্ডের আল্টো ইউনিভার্সিটির দুই পদার্থবিজ্ঞানী এমন একটি নতুন তত্ত্বের প্রস্তাব দিয়েছেন যা মহাকর্ষকে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির আওতায় আনতে পারে।

ফিনল্যান্ডের আল্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই পদার্থবিদ, ড. মিক্কো পার্তানেন এবং ড. ইউক্কা তুল্কি, একটি নতুন পদ্ধতির প্রস্তাব করেছেন যা দীর্ঘদিন ধরে খোঁজা হচ্ছে এমন কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির মাধ্যমে মাধ্যাকর্ষণ বোঝার সম্ভাব্য পথ খুলে দিতে পারে। এই পদ্ধতি প্রকৃতিতে বিদ্যমান সব শক্তিকে একটি একক ও সংগঠিত কাঠামোয় একত্রিত করার লক্ষ্যে একটি বড় অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

পার্তানেন এবং তুল্কি একটি সমরূপতাভিত্তিক (symmetry-based) পদ্ধতি তৈরি করেছেন যা মাধ্যাকর্ষণকে একটি গেজ তত্ত্ব (gauge theory) হিসেবে পুনর্গঠন করে। গেজ তত্ত্ব হলো সেই ধরনের তত্ত্ব যা বলবাহী ক্ষেত্র (force-carrying fields) দিয়ে কণার পারস্পরিক ক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে। এই গেজ তত্ত্বই স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ভিত্তি, যা সফলভাবে তড়িৎচৌম্বক, দুর্বল নিউক্লীয় ও সবল নিউক্লীয় বল ব্যাখ্যা করে। তবে মাধ্যাকর্ষণ বরাবরই এই কাঠামোর বাইরে ছিল, কারণ সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের কাঠামো এদের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তাঁদের নতুন মডেল এমন একটি গেজ তত্ত্ব প্রস্তাব করে যা স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সমরূপতার প্রতিফলন ঘটায়। এর ফলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও সাধারণ আপেক্ষিকতার মধ্যে সেতুবন্ধন সম্ভব হতে পারে। যার মাধ্যমে পদার্থবিজ্ঞানের এই দুটি সফল কিন্তু পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যেতে পারে। যদি এটি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়, তাহলে ব্ল্যাক হোলের সিঙ্গুলারিটি কিংবা বিগ ব্যাংয়ের প্রথম মুহূর্তের মতো রহস্যময় ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করার নতুন পথ উন্মোচিত হবে।

গবেষকেরা বলেছেন, "যেসব পরিস্থিতিতে কোয়ান্টাম প্রভাব এবং প্রবল মাধ্যাকর্ষণ বল একসঙ্গে কাজ করে, সেখানে মহাবিশ্বের আচরণ বোঝার জন্য কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটি একটি অপরিহার্য তত্ত্ব।"

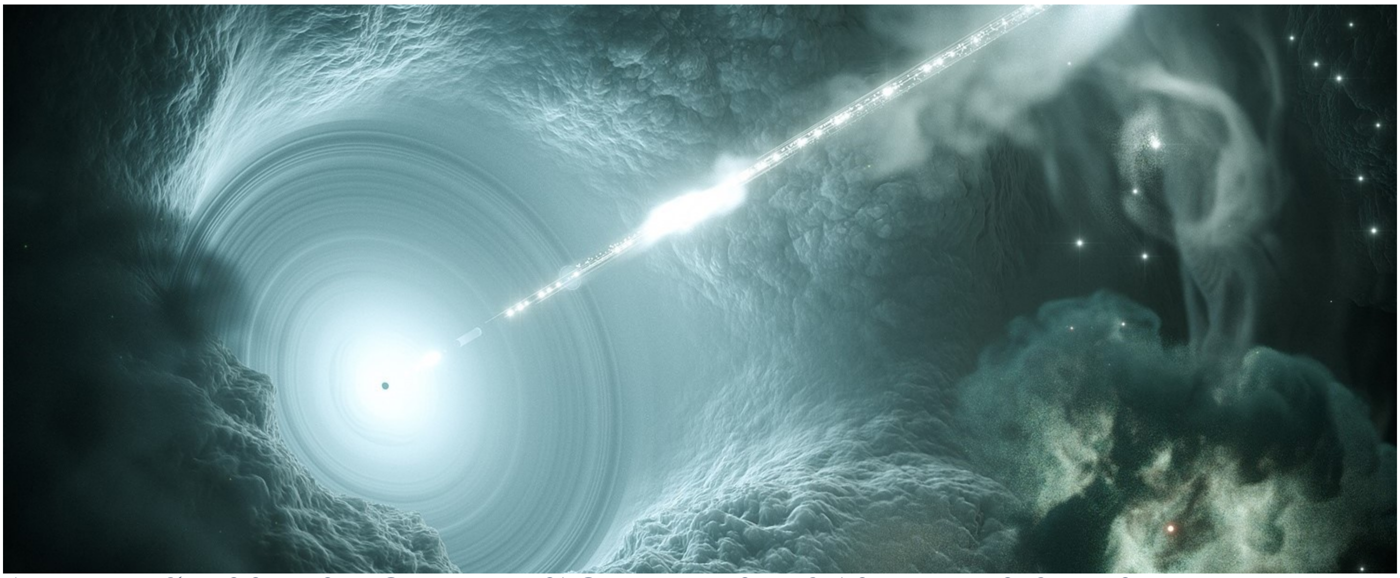

স্ট্যান্ডার্ড মডেল পার্টিকেল ফিজিক্সে তড়িৎচুম্বকীয়, দুর্বল ও সবল নিউক্লীয় বল অর্থাৎ প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলের মধ্যে তিনটির বর্ণনা দিতে পারে। চতুর্থ বল অর্থাৎ মহাকর্ষ, স্ট্যান্ডার্ড মডেলের দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। এর কারণ এর পেছনের দুটি তত্ত্ব, সাধারণ আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম ফিল্ড থিয়োরি, একে অপরের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যেখানে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিয়োরি ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট ও সসীম মাত্রার সিমেট্রি নিয়ে কাজ করে যা কোয়ান্টাম ফিল্ডের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেখানে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব (General Relativity) নির্ভর করে অসসীম মাত্রার ও অনির্দিষ্ট আকারের বাহ্যিক মহাকাশ-সময় সংক্রান্ত সমান্তরালতার ওপর। মিক্কো পার্তানেন ও ইউক্কা তুল্কি মহাকর্ষের গেইজ থিওরি এমনভাবে গঠন করার চেষ্টা করছেন, যা স্ট্যান্ডার্ড মডেলের মৌলিক বলগুলোর মতই সঙ্কুচিত, সসীম-মাত্রিক সিমেট্রি ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করা যায় (DESY/Science Communication Lab)

তাঁদের তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে renormalization নামে একটি জটিল গাণিতিক পদ্ধতি, যা কোয়ান্টাম ফিল্ডের হিসাব-নিকাশে উদ্ভূত অসীম মান সামাল দিতে ব্যবহৃত হয়। তাঁরা এই পদ্ধতির প্রথম ধাপে সফলভাবে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন, যদিও পুরো পদ্ধতিটি সব স্তরে কার্যকর কি না, তা এখনো যাচাই চলছে।

যদি এই renormalization পদ্ধতির বিস্তার সম্ভব না হয়, তাহলে তত্ত্বে নন-ফিজিক্যাল (non-physical), অসীম মান চলে আসতে পারে, যা গোটা কাঠামোকে অকার্যকর করে তুলবে। তা সত্ত্বেও, গবেষকেরা আশাবাদী যে তারা শিগগিরই এসব চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

যদিও এই কাঠামো এখনো পূর্ণাঙ্গ নয়, এটি "থিওরি অব এভ্রিথিং" (Theory of Everything) তৈরির পথে একটি প্রতিশ্রুতিশীল দিক নির্দেশ করছে। থিওরি অব এভ্রিথিং হবে এমন একটি একীভূত তত্ত্ব যা প্রকৃতির সব মৌলিক বলকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। যদি এটি সম্পূর্ণভাবে সঠিক প্রমাণিত হয়, তাহলে পদার্থবিজ্ঞানে এক বৈপ্লবিক যুগের সূচনা হতে পারে।

"কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও সাধারণ আপেক্ষিকতার মধ্যে সেতুবন্ধন সম্ভব হতে পারে নতুন তত্ত্ব সঠিক হলে"

পার্তানেন ও তুল্কি আশা করছেন, আগামী কয়েক বছরে তাঁরা আরও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করবেন, যা শতাব্দীব্যাপী কোয়ান্টাম গ্র্যাভিটির সন্ধানে এক আশাব্যঞ্জক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।

লেখক: পুষ্পিতা আনোয়ার

রেফারেন্স: *DOI: 10.1088/1361-6633/adc82e*

প্রযুক্তি

অর্গানয়েড ইন্টেলিজেন্স

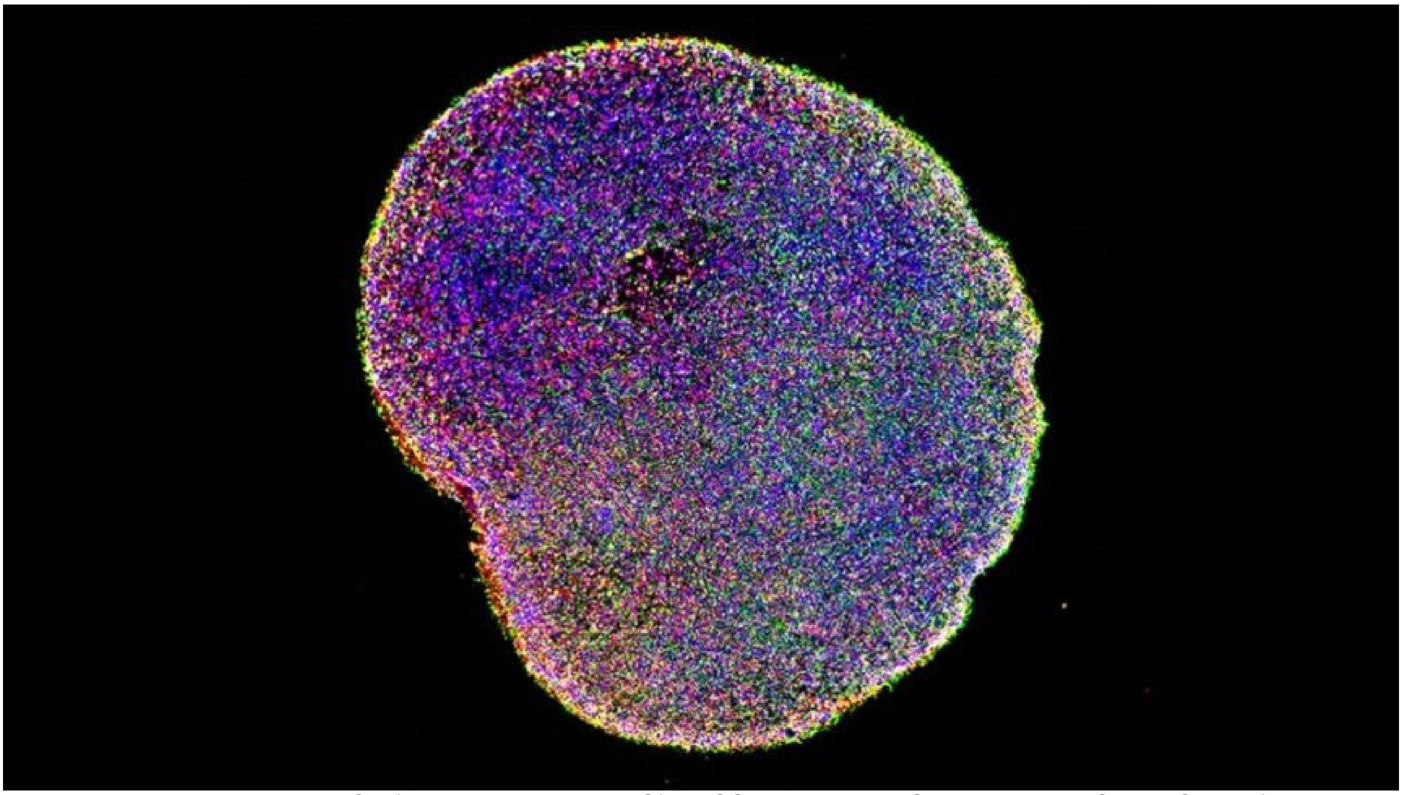

ল্যাবে ছয় মাস ধরে বেড়ে ওঠার পর, একটি ব্রেইন অর্গানয়েডে নানা রকমের নিউরন (বিভিন্ন রঙে দেখানো) গঠিত হয়, যা মানুষের মস্তিষ্কের জটিলতাকে উপস্থাপন করে (Paola Arlotta Laboratory, Harvard University)

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI) আজ বিশ্বে এক নিঃশব্দ বিপ্লব এনেছে। যদি ভবিষ্যতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা শুধু যন্ত্র না হয়ে আংশিকভাবে "জীবন্ত" হয়? এখানেই আসে নতুন এক ধারণা— অর্গানয়েড ইন্টেলিজেন্স (Organoid intelligence) বা ওআই (OI)। এটি এমন এক প্রযুক্তি, যেখানে মস্তিষ্কের কোষের মতো জীবন্ত কোষ দিয়ে তৈরি হচ্ছে কম্পিউটার। একে বলে বায়োকম্পিউটিং — যেখানে প্রযুক্তি আর প্রাণ একসঙ্গে কাজ করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের বর্তমান বদলেছে, আর ওআই হয়তো বদলে দেবে আমাদের ভবিষ্যৎ। অর্গানয়েড ইন্টেলিজেন্ট কম্পিউটার সিস্টেমকে বায়োহাইব্রিড সিস্টেম বলা যেতে পারে, কারণ এখানে জীবন্ত কোষ ও যান্ত্রিক উপাদানের একত্রে ব্যবহার হয়। কল্পনা করুন, যদি কোষ দিয়ে তৈরি একটা ছোট্ট মস্তিষ্ক দাবা খেলতে পারে! হ্যাঁ, ঠিক শুনেছেন! এই চমকপ্রদ প্রযুক্তির নামই হলো অর্গানোয়েড ইন্টেলিজেন্স (OI)। এটি এমন একটি নতুন দুনিয়া যেখানে জীবন্ত কোষ ব্যবহার করে কম্পিউটার বানানো হচ্ছে!

অর্গানয়েড মানে হলো ল্যাবে তৈরি করা ছোট্ট মস্তিষ্কের টুকরো। দেখতে মস্তিষ্কের মতো না, কিন্তু সেই মস্তিষ্কের মতোই কাজ করতে পারে! অর্গানয়েড ইন্টেলিজেন্স বলতে বোঝানো হয় মানব স্টেম সেল থেকে তৈরি, ক্ষুদ্র, ত্রিমাত্রিক মস্তিষ্কসদৃশ কোষগুচ্ছ (organoids) ব্যবহার করে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বা হিসাব-নিকাশ করা। গতানুগতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেখানে সিলিকন চিপ ও ডিজিটাল লজিকে ভিত্তি করে তৈরি, সেখানে ওআই জীবন্ত কোষের জটিলতা ও নমনীয়তা ব্যবহার করে কাজ করে। এটি শুধু একটি নতুন কম্পিউটিং পদ্ধতি নয়, বরং মানব মস্তিষ্ক ও চিন্তাভাবনার প্রকৃতি বুঝতে এক অভিনব উপায়ও বটে।

এইভাবে, অর্গানয়েড ইন্টেলিজেন্স জীববিজ্ঞান ও যন্ত্রের মধ্যে এক সেতুবন্ধন গড়ে তোলে। জৈবিক পদ্ধতির মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে আরও উন্নত করে তোলা সম্ভব যেখানে মানুষের মতো শিখতে পারা, খাপ খাইয়ে নিতে পারা এবং নতুনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা যুক্ত হয়। এই ছোট্ট কোষগুলো

একে অপরের সাথে সংযোগ তৈরি করে, শিখতে পারে, এমনকি অদ্ভুত কাজও করতে পারে। আপনার হয়তো জানেন, আমাদের সাধারণ কম্পিউটার সিলিকন চিপ দিয়ে কাজ করে এবং গাণিতিক হিসাব দ্রুত করতে পারে। কিন্তু যখন জটিল তথ্যের প্রশ্ন আসে বা একসাথে অনেক কাজ করতে হয়, তখন কম্পিউটার হোঁচট খায়। এখানে অর্গানয়েড ইন্টেলিজেন্স একদম নতুন কিছু নিয়ে আসছে। এটা জীবন্ত কোষ দিয়ে এমন কম্পিউটার তৈরি করতে চায়, যেটা কম শক্তি খরচ করবে, দ্রুততর হবে এবং আরো হবে অনেক শক্তিশালী ও দক্ষ।

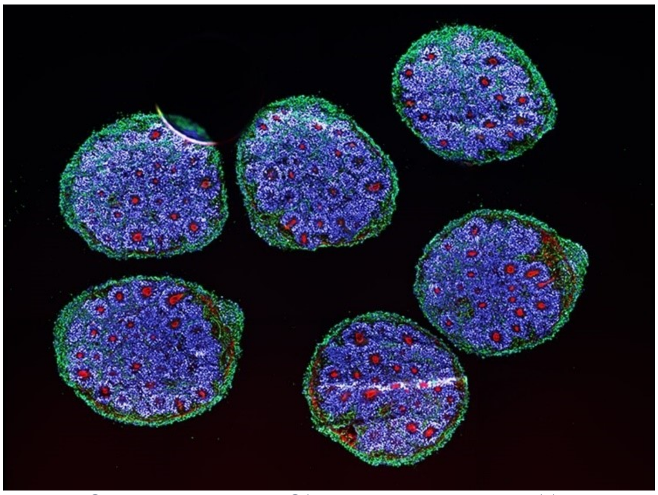

মানব মস্তিষ্কের অর্গানয়েডে নিউরন ও তাদের ডেনড্রাইট (সবুজ), টেলেন্সেফালিক (অগ্রমস্তিষ্ক) কোষ (নীল), এবং কোষ থেকে কোষে সংযোগকারী এক ধরনের বন্ধন যাকে টাইট জংশন (লাল) বলা হয়, দেখা যাচ্ছে (Noelia Anton Bolanos/Irene Faravelli)

অর্গানোয়েড ইন্টেলিজেন্স আসলে মানুষের মস্তিষ্কের মতো কাজ করতে পারে। মস্তিষ্ক কীভাবে একসাথে অনেক কাজ করে এবং অসম্পূর্ণ বা অনিশ্চিত তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, ঠিক সেভাবেই অর্গানোয়েড শিখতে পারে এবং কাজ করতে পারে। যারা এই প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন, তাদের ধারণা, একদিন এই অর্গানয়েডগুলো প্রচলিত কম্পিউটার এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে! অর্গানয়েড ইন্টেলিজেন্সের মূলেই রয়েছে বায়োকম্পিউটার — এমন কম্পিউটার যেগুলো জীববৈজ্ঞানিক উপাদান (যেমন নিউরন বা DNA) ব্যবহার করে কাজ করে। সাধারণ কম্পিউটার যেখানে ০ ও ১ (বাইনারি কোড) এবং বৈদ্যুতিক সংকেতের মাধ্যমে চলে, বায়োকম্পিউটার সেখানে জীবন্ত কোষের জটিল ক্রিয়াকলাপ ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করে। এই প্রযুক্তি শুধু কম্পিউটারেই নয়, চিকিৎসাতেও দারুণ কাজ করতে পারে!

স্টেম সেল পদ্ধতির উদ্ভাবকরা প্রমাণ করেছেন ত্বক থেকেও নিউরন উৎপাদন করা সম্ভব। এই নিউরনগুলো দিয়ে তৈরি মস্তিষ্ক অর্গানয়েড–

- গবেষণায় মস্তিষ্কের কার্যপদ্ধতি অনুকরণ করতে পারে।
- নতুন ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আগেভাগেই যাচাই করা সম্ভব।
- মস্তিষ্ক বিকাশ, স্মৃতি, ও শেখার প্যাটার্ন বুঝতে সাহায্য করে।

বর্তমানে ব্যবহৃত প্রতিটি অর্গানয়েডে ~৫০,০০০ কোষ থাকে, যা একটি ফলের মাছি (ছোট মাছি)-র স্নায়ুতন্ত্রের সমান। ওআই তৈরিতে প্রয়োজন একটি অর্গানয়েডে প্রায় ১ কোটি কোষ — মানে অনেক বড় আকারে তৈরি করতে হবে। ধরুন, অটিজম রোগী থেকে কোষ নিয়ে, সেগুলোর মাধ্যমে মস্তিষ্কের অর্গানয়েড তৈরি করে, বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারবেন — কীভাবে এসব রোগ কাজ করে, কোথায় সমস্যা হচ্ছে এবং কীভাবে আরও ভালো চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব। এই নতুন পদ্ধতিতে রোগের গভীরে গিয়ে সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব! ওআই ভবিষ্যতে মানব মেডিসিনে বিপ্লব ঘটাতে পারে, যেমন:

- আলৎসহাইমার রোগীর ত্বক থেকে তৈরি অর্গানয়েডে স্মৃতি পরীক্ষা।
- ওষুধ বা রাসায়নিক পদার্থ শেখার ও স্মৃতিতে কী প্রভাব ফেলে তা পর্যবেক্ষণ।
- অটিজম, স্মৃতিলোপ, বা স্নায়ুগত ব্যাধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

তবে, এই প্রযুক্তি এতই নতুন যে, অনেক বড় প্রশ্নও সামনে আসছে। যেমন, যদি অর্গানয়েডরা একসময় কনশাস হয়ে ওঠে, তাহলে আমাদের তাদের সাথে কীভাবে আচরণ করা উচিত? এরকম আরও অনেক প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীরা কাজ করছেন। কিছু গবেষক এমনকি সাইলেন্ট সাফারিং (অনুভব করতে পারে কিন্তু প্রকাশ করতে না পারা) থেকে রক্ষা করতে, স্মৃতি মুছে ফেলার সীমা (enforced amnesia) ও নির্দিষ্ট সময় পর মেমোরি রিসেট করার মতো ধারণা দিয়েছেন। মানব কোষ ব্যবহার করে তৈরি হওয়া অর্গানয়েড নিয়ে নৈতিকতা, জীববিজ্ঞানের সীমা এবং প্রযুক্তির একত্রীকরণ—সবকিছুই মাথায় রাখতে হবে।

অর্গানয়েডগুলির মধ্যে কোষগুলো দেখতে মানুষের মস্তিষ্কের ছোট সংস্করণ না হলেও এই ছোট্ট পেন ডট সাইজ কোষগুলোর মধ্যে নিউরন থাকে, যা মস্তিষ্কের মতো কাজ করে এবং একে অপরের সাথে বহু সংযোগ তৈরি করতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা একে "ডিশে ইন্টেলিজেন্স" বলেন।

ড. থমাস হার্টুং-এর ল্যাবে তাকে ব্রেইন অর্গানয়েডের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে (Will Kirk/Johns Hopkins University)

ড. থমাস হার্টুং ২০১২ সালে মানব ত্বক থেকে মস্তিষ্ক অর্গানয়েড তৈরি শুরু করেন এবং এখন তিনি ও তার টিম এমন বায়োহার্ডওয়্যার (bio hardware) তৈরি করছেন, যা সুপারকম্পিউটারের তুলনায় অনেক বেশি শক্তি-সাশ্রয়ী হতে পারে। Organoid Intelligence আমাদের সামনে এমন একটি দিগন্ত খুলে দিচ্ছে, যেখানে জীববিজ্ঞান ও প্রযুক্তি একসাথে কাজ করে এমন সমস্যার সমাধান করবে যা আগে কেবল কল্পনার জগতেই ছিল।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় এবং জনস হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অফ পাবলিক হেলথ-এর ড. লেনা স্মিরনোভা বলেন, "আমরা এখন এমন এক যুগে প্রবেশ করছি, যেখানে মানুষ ও মানুষের তৈরি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে।"

তাহলে চিন্তা করুন, এটাই ভবিষ্যত! অর্গানয়েড ইন্টেলিজেন্স পুরোপুরি প্রস্তুত না হলেও, এর সম্ভাবনা অনেক বিশাল। হয়তো একদিন আমাদের পৃথিবী বদলে যাবে এবং আমরা এক নতুন প্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করবো!

লেখক: রামিছা আলী সালওয়া

শিক্ষার্থী, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

জেনেটিক্স

ঘুম কম লাগে যাদের

কিছু মানুষের জিনে বিরল মিউটেশন থাকার ফলে তারা মাত্র ৩-৬ ঘণ্টা ঘুমিয়েও সতেজ থাকতে পারেন। গবেষকরা নতুন একটি SIK3 জিনে এমন মিউটেশন শনাক্ত করেছেন, যা ঘুমের চাহিদা কমাতে সাহায্য করে। এই গবেষণা ভবিষ্যতে ঘুমজনিত রোগের চিকিৎসায় সহায়ক হতে পারে।

বেশিরভাগ মানুষ প্রতিদিন রাতে প্রায় আট ঘণ্টা ঘুম ছাড়া স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না। কিন্তু কিছু মানুষ আছেন যারা মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েও পুরোপুরি সতেজ ও কর্মক্ষম থাকেন। সম্প্রতি *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*–এ প্রকাশিত এক গবেষণায় বিজ্ঞানীরা এমন এক বিরল জিনগত পরিবর্তনের সন্ধান পেয়েছেন, যা কারো ঘুমের চাহিদা স্বাভাবিকের চেয়ে কমিয়ে দিতে পারে।

প্রাকৃতিকভাবে যেসব মানুষ প্রতিদিন তিন থেকে ছয় ঘণ্টা ঘুমান কিন্তু তারপরও তাদের চলাফেরায় কোনো নেতিবাচক প্রভাব দেখা যায় না তাদের জিনগত বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারলে ইনসমনিয়া বা অতিরিক্ত ঘুমের মতো বিভিন্ন ঘুমের সমস্যার চিকিৎসা আবিষ্কারে সহায়তা মিলতে পারে, বলছেন গবেষক এবং ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া, সান ফ্রান্সিসকোর নিউরোসায়েন্টিস্ট ও জেনেটিসিস্ট ইং-হুই ফু।

তিনি বলেন, “আমরা যখন ঘুমাই, তখনো আমাদের শরীর কাজ করতে থাকে—নিজেকে পরিশুদ্ধ করে ও ক্ষতিগ্রস্ত কোষ মেরামত করে। যেসব মানুষ খুব অল্প ঘুমেই সুস্থ থাকেন, তাদের শরীর এসব কাজ অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে।”

২০০০ সালের দিকে ফু ও তার সহকর্মীরা এমন কিছু মানুষের কাছ থেকে শুনতে পান, যারা রাতে মাত্র ছয় ঘণ্টা বা তার কম ঘুমান। একটি মা ও মেয়ের জিন বিশ্লেষণ করে গবেষক দল দেখতে পান, তাদের ঘুম–জাগরণ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক একটি জিনে একটি বিরল মিউটেশন (জিনগত পরিবর্তন) রয়েছে। গবেষকরা ধারণা করেন, এই মিউটেশনই ওই পরিবারের ঘুম কম লাগার কারণ। এরপর থেকে অনেক ঘুম-কম-লাগা মানুষ ফু-এর গবেষণাগারে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করতে থাকেন।

এখন পর্যন্ত গবেষকেরা কয়েকশো প্রাকৃতিকভাবে কম ঘুমানো ব্যক্তির খোঁজ পেয়েছেন। তাদের গবেষণায় এখন পর্যন্ত চারটি জিনে পাঁচটি ভিন্ন মিউটেশনের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবে দেখা গেছে, বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে মিউটেশনগুলো ভিন্ন ভিন্ন রকমের।

নতুন এক মিউটেশনের খোঁজ

সাম্প্রতিক গবেষণায় গবেষকেরা একজন প্রাকৃতিকভাবে কম ঘুমানো ব্যক্তির ডিএনএ বিশ্লেষণ করে নতুন এক মিউটেশনের খোঁজ পান। এটি ছিল SIK3 নামের একটি জিনে SIK3-N783Y মিউটেশন, যেটি একটি বিশেষ এনজাইম উৎপন্ন করে। এই এনজাইম স্নায়ুকোষগুলোর মাঝের ফাঁকে সক্রিয় থাকে। এর আগে জাপানি গবেষকেরা এই একই জিনের এক ভিন্ন মিউটেশন ইঁদুরে অতিরিক্ত ঘুমের কারণ হতে দেখেছেন।

গবেষক দল নতুন মিউটেশনটি ইঁদুরের জিনে প্রয়োগ করে দেখতে পান, যেসব ইঁদুরে এই পরিবর্তন ছিল, তারা অন্য ইঁদুরের তুলনায় প্রতিদিন গড়ে ৩১ মিনিট কম ঘুমাচ্ছে। সাধারণত ইঁদুর দিনে প্রায় ১২ ঘণ্টা ঘুমায়। গবেষণায় আরও দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট এনজাইমটি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে মস্তিষ্কের সিন্যাপসে—মানে, স্নায়ু কোষের সংযোগস্থলে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে, এই মিউটেশন সম্ভবত ঘুমের সময় মস্তিষ্কের স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ করে তোলে।

তবে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের নিউরোলজিস্ট ক্লিফোর্ড স্যাপার বলেন, যেহেতু এই মিউটেশনের কারণে ইঁদুর মাত্র অল্প সময়ের ঘুম হারায়, তাই এটি একমাত্র বা প্রধান কারণ না ও হতে পারে। তবে এটি SIK3 জিন সম্পর্কে পূর্বের

গবেষণার সঙ্গে ভালোভাবেই মেলে এবং ঘুমের জৈবিক ভিত্তি বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

গবেষকরা এখনো খতিয়ে দেখছেন, কীভাবে এসব জিন ও তাদের ভিন্নতা ঘুমকে প্রভাবিত করে। ফু আশাবাদী, ভবিষ্যতে যদি আরও মিউটেশন চিহ্নিত করা যায়, তাহলে মানুষে ঘুমের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বোঝা সহজ হবে—যা একদিন ঘুম সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

লেখক: জারা জাইন্ড

রেফারেন্স: DOI: 10.1073/pnas.2500356122

বাংলাদেশ

ঢাকার ডেঙ্গু দমনে নতুন আশার আলো

ঢাকার স্থানীয় এডিস মশায় একধরনের ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ করে বিজ্ঞানীরা এক নতুন মশার প্রজাতি (wAlbB2-Dhaka) তৈরি করেছেন, যা ডেঙ্গু ভাইরাস ছড়ানোর ক্ষমতা ৯২.৭% পর্যন্ত কমিয়ে দেয়। এই মশাগুলো প্রজননে সক্ষম এবং ভাইরাস রোধে কার্যকর। এটি বাংলাদেশের ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে একটি টেকসই ও সম্ভাবনাময় সমাধান হতে পারে।

বাংলাদেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। ২০২৩ সালে বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ডেঙ্গু দেখা যায়, সেখানে ১ হাজার ৭০০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। প্রচলিত কীটনাশকনির্ভর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি মশার কীটনাশক প্রতিরোধক্ষমতা এবং অপ্রতুল কভারেজের কারণে কার্যকারিতা হারাচ্ছে। তবে, এবার বিজ্ঞানীরা ডেঙ্গু মোকাবেলায় সম্ভাবনাময় একটি নতুন সমাধানের সন্ধান দিয়েছেন — ঢাকার স্থানীয় এডিস মশা (*Aedes aegypti*)-র দেহে এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া (*Wolbachia*) সংক্রমণ ঘটিয়ে মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু ভাইরাস ছড়ানো রোধে দারুণ সাফল্য পেয়েছেন। এ বিষয়ক গবেষণাপত্রটি *Scientific Reports* জার্নালে প্রকাশিত হয়।

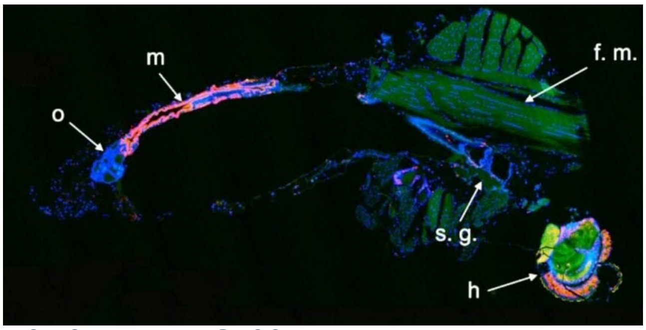

দেশি এডিস মশার অভ্যন্তরীন বিভিন্ন অর্গানকে দেখা যাচ্ছে (Hasan Mohammad Al-Amin)

অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণায়, ঢাকার এডিস মশার সঙ্গে 'wAlbB' নামক *Wolbachia* ব্যাকটেরিয়ায় সংক্রমিত মশার প্রজনন ঘটিয়ে একটি নতুন মশার প্রজাতি তৈরি করা হয়, যার নাম দেয়া হয় wAlbB2-Dhaka। গবেষণায় দেখা যায়, এই মশাগুলো:

- ১০০% *Wolbachia* সংক্রমণ পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তর করতে সক্ষম।
- ডেঙ্গু ভাইরাস বহনে সক্ষমতা ৯২.৭% পর্যন্ত হ্রাস করে।
- তাদের প্রজননক্ষমতা, বেঁচে থাকার হার এবং কীটনাশক প্রতিরোধক্ষমতা প্রাকৃতিক ঢাকার মশার মতোই শক্তিশালী।

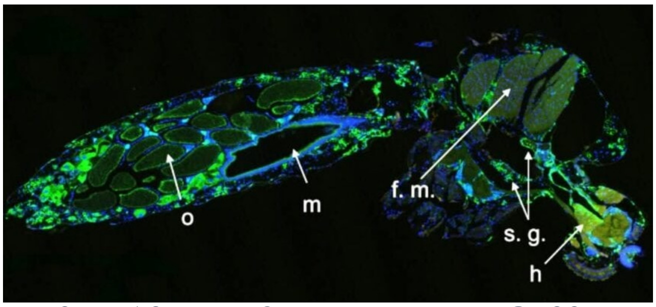

ওলবাচিয়া ব্যাক্টেরিয়াযুক্ত একটি মশার সংকরায়নের অভ্যন্তরীন বিভিন্ন অর্গান (Hasan Mohammad Al-Amin)

গবেষণায় আরো দেখা যায়, wAlbB2-Dhaka মশাগুলোর লালা থেকে ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কোঠায় — মাত্র ৫.৯% ক্ষেত্রে ভাইরাস পাওয়া গেছে, যেখানে সাধারণ ঢাকার মশায় তা ছিল প্রায় ৮৩%।

এই গবেষণার অন্যতম গবেষক ড. হাসান মোহাম্মদ আল-আমিন বলেন, "আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের বাংলাদেশের কোনো মশাতে এই প্রথম আমরা ডেঙ্গু সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পেরেছি। বর্তমানে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করার যে তিনটি উপায় আমাদের হাতে আছে তার সবগুলো উপায়ই ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। আমরা গবেষণা করে দেখিয়েছি যে মশা কীটনাশক প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। আর তাছাড়া ডেঙ্গু ভ্যাকসিন এখনো গবেষণা পর্যায়ে। আমরা একটি এমন মশার স্ট্রেইন তৈরি করতে পেরেছি যা ঢাকার জলবায়ু ও স্থানীয় মশার বৈশিষ্ট্যের সাথে মানানসই এবং কার্যকরভাবে ডেঙ্গু ভাইরাস ছড়ানো রোধ করতে সক্ষম।"

তিনি আরো বলেন, "আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। আমাদের গবেষণার ফলাফল শুধুমাত্র গবেষণাগারে করা পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে। অস্ট্রেলিয়াতে কোয়ারেন্টাইন নীতিমালার কারণে বাংলাদেশের মশা এখানে গবেষণাগারের বাইরে পরীক্ষা করা যায়নি।"

"এডিস মশার দেহে এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ ঘটিয়ে মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু ভাইরাস ছড়ানো রোধে দারুণ সাফল্য মিলেছে।"

এই গবেষণা ভবিষ্যতে ঢাকায় *Wolbachia*-সংক্রমিত মশা মুক্তির মাধ্যমে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে। তবে, মাঠপর্যায়ে প্রয়োগের আগে জনসচেতনতা, পরিবেশগত নিরাপত্তা এবং সরকারি অনুমোদনের বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

লেখক: ফাইজাহ্ সুলতানা

রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41598-025-98093-x*

বাংলাদেশ

দেশের জলজ পোকার দেহে মাইক্রোপ্লাস্টিকের প্রথম প্রমাণ

ধলেশ্বরী নদীর জলজ পতঙ্গের দেহে প্রথমবারের মতো মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা শনাক্ত হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে এসব পতঙ্গ নদীজুড়ে প্লাস্টিক দূষণের বাহক ও পরিবেশগত ঝুঁকির সূচক হিসেবে কাজ করছে। এই দূষণ খাদ্য শৃঙ্খল পেরিয়ে মানবদেহেও প্রবেশ করতে পারে।

Li Jianbo

বাংলাদেশের ধলেশ্বরী নদীতে জলজ পোকামাকড়ের দেহে প্রথমবারের মতো শনাক্ত হলো বিপজ্জনক মাইক্রোপ্লাস্টিক (MPs)। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক গত ৫ই মে, ২০২৫ *Scientific Reports* জার্নালে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে ঢাকার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ধলেশ্বরী নদীতে। নদীর পানি, পলি ও ছয় প্রজাতির জলজ পতঙ্গ পরীক্ষা করে দেখা যায়, এরা

উল্লেখযোগ্য হারে মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রহণ করেছে। এটি শুধু তাদেরই নয়, পুরো খাদ্য শৃঙ্খলের জন্যও হুমকিস্বরূপ।

গবেষণায় দেখা গেছে, নদীর প্রতি লিটার পানিতে গড়ে ১৪৩টি এবং প্রতি কেজি পলিতে প্রায় ৩০ হাজার মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা রয়েছে। সবচেয়ে বেশি কণা পাওয়া গেছে *Diplonychus rusticus* নামক এক প্রজাতির দেহে (প্রতি গ্রামে প্রায় ৫৮টি কণা)। এই কণাগুলোর রঙ, আকার ও গঠন পানি ও পলিতে পাওয়া কণার সঙ্গেই মিলে গেছে। অর্থাৎ, পতঙ্গেরা সরাসরি নদী থেকেই এসব কণা গ্রহণ করছে এবং পরবর্তীতে সেগুলো খাদ্য শৃঙ্খলে ছড়িয়ে পড়ছে।

ধলেশ্বরী নদীর যেসকল জলজ প্রজাতির (Diplonychus annulatus, Diplonychus rusticus, Ranatra sp.) দেহে মাইক্রোপ্লাস্টিক মিলেছে (Haque, M.R. et al./Scientific Reports)

এই মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলোর মধ্যে রয়েছে আটটি ভিন্ন ধরনের পলিমার—HDPE, PVC, PS, Nylon সহ আরও কিছু, যেগুলো সাধারণত ব্যবহার হয় প্যাকেজিং, কাপড়, খেলনা বা প্রসাধন সামগ্রীতে। গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন যে পাতলা ফাইবারজাত প্লাস্টিকই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পতঙ্গের দেহে প্রবেশ করছে। এসব ছোট (<০.৫ মিলিমিটার) কণা সহজেই পতঙ্গের হজমনালিতে ঢুকে পড়তে পারে, খাদ্যের মতোই।

এদের খাদ্যাভ্যাস, ওজন, দৈর্ঘ্য এমনকি পরিবেশে বসবাসের ধরন – সবই মাইক্রোপ্লাস্টিক গ্রহণে ভূমিকা রাখছে। শিকারি প্রকৃতির পতঙ্গদের দেহে বেশি কণা পাওয়া গেছে, কারণ তারা ছোট মাছ, জলজ লার্ভা ইত্যাদি খায়, যারা নিজেরাও প্লাস্টিক দূষণের শিকার।

জলজ পোকার দেহে পাওয়া মাইক্রোপ্লাস্টিক (Haque, M.R. et al./Scientific Reports)

গবেষণাটি আরও জানায় যে ধলেশ্বরী নদীর পানি ও পলি এখন “মধ্যম ঝুঁকির” অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু পলিমার হ্যাজার্ড সূচক অনুযায়ী ঝুঁকি ‘অত্যন্ত উচ্চ’ স্তরে পৌঁছে গেছে। অর্থাৎ, এই দূষণ শুধু জলজ প্রাণী নয়, মানব স্বাস্থ্যের জন্যও পরোক্ষ হুমকি হয়ে উঠছে।

এই গবেষণার ফলাফল আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেয়: নদীর পানি শুধু দূষিতই নয়, তা একটি চলমান পরিবেশগত বিপদের বাহক। আর জলজ পতঙ্গেরা, যাদের আমরা হয়তো তেমন গুরুত্ব দিই না, তারা আসলে পরিবেশ দূষণের নিখুঁত সূচক।

বাংলাদেশে এখন সময় এসেছে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা, নীতিমালায় তার প্রতিফলন ঘটানো এবং নদীভিত্তিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের দিকে নজর দেওয়া।

লেখক: ফাইজাহ্ সুলতানা
রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41598-025-88024-1*

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান

আমরা কীভাবে মিষ্টি স্বাদ অনুভব করি?

বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো মানুষের মিষ্টি স্বাদগ্রাহী রিসেপ্টরের আণবিক গঠন উন্মোচন করেছেন। এই আবিষ্কারের মাধ্যমে বোঝা গেল কৃত্রিম মিষ্টিকারক কীভাবে রিসেপ্টরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের জিভে মিষ্টির অনুভূতি সৃষ্টি করে। এটি ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যকর মিষ্টিকারক তৈরিতে সহায়ক হতে পারে।

চিনি বহুদিন ধরেই মানুষের স্বাদের অনুভূতিকে মুগ্ধ করে আসছে, সেইসাথে জনস্বাস্থ্যের জন্য হয়ে উঠেছে এক বিশাল ঝুঁকি। এবার বিজ্ঞানীরা এই আকর্ষণের পেছনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন।

নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল প্রথমবারের মতো মানুষের মিষ্টি স্বাদগ্রাহী রিসেপ্টরের আণবিক গঠন চিহ্নিত করেছে এবং দেখিয়েছে যে বহুল ব্যবহৃত দুটি কৃত্রিম সুইটনার (সুক্রালোজ ও অ্যাসপারটেম) কীভাবে এই রিসেপ্টরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে সক্রিয় করে। গবেষণাপত্রটি গত ৭ মে, ২০২৫ এ *Cell* জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। এটি আমাদের স্বাদ উপলব্ধির পেছনের জটিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যবান্ধব কোমল পানীয়, চুইংগাম ও মিষ্টিজাত খাবার তৈরির পথ খুলে দিতে পারে।

গবেষণার প্রধান নিউরোবিজ্ঞানী চার্লস জুকার বলেন, “এই একটি মাত্র রিসেপ্টরই আমাদের চিরকালীন চিনি-প্রীতির জন্য দায়ী। এখন আমরা এর গঠন জানি, তাই হয়তো আমরা এর কার্যক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের পথ খুঁজে পেতে পারি।” অর্থাৎ, এমন যৌগ তৈরি করা সম্ভব হতে পারে যা এই রিসেপ্টরের কার্যপ্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করে স্বাদগ্রহণের ধরন পাল্টে দিতে পারে।

আণবিক গঠনের খোঁজে

ফলমূল থেকে শুরু করে মিষ্টি দই; যে কোনো খাবার যা চিনি বা তার বিকল্প ধারণ করে, তা আমাদের জিভের মিষ্টি রিসেপ্টরকে সক্রিয় করে তোলে এবং মস্তিষ্কে একধরনের সংকেত পাঠায় ডেটা রিওয়ার্ড পাবার মতো।

২০০১ সালে জুকার ও তার দল প্রথম এই রিসেপ্টর শনাক্ত করেন, যা দুটি প্রোটিন (TAS1R2 ও TAS1R3) দ্বারা গঠিত একটি যৌগিক গঠন। একটি প্রোটিন মিষ্টি অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়, অন্যটি গঠনগত সমর্থন দেয়।

কিন্তু ২০ বছরেরও বেশি সময় গবেষণার পরও এই রিসেপ্টরের সুনির্দিষ্ট গঠন অজানাই রয়ে গিয়েছিল। এবার অবশেষে গবেষক দলটি এটির গঠন নির্ধারণে সফল হয়েছে। তারা প্রথমে প্রোটিন কমপ্লেক্সটিকে স্থিতিশীল করে তোলেন, তারপর ক্রায়ো-ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপির মাধ্যমে এর পরমাণু স্তরের ছবি ধারণ করেন—যেখানে সুক্রালোজ ও অ্যাসপারটেম যুক্ত অবস্থায় রিসেপ্টরের গঠন দেখা যায়। এরা প্রাকৃতিক চিনির তুলনায় রিসেপ্টরের সঙ্গে আরও দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়, ফলে ছবি তোলার জন্য এটি স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে।

রহস্য উদঘাটন

গবেষণায় দেখা যায়, TAS1R2 উপঅঙ্গে একটি ক্ষুদ্র গহ্বর আছে, যেখানে সুক্রালোজ বা অ্যাসপারটেম যুক্ত হতে পারে। তবে এরা একটু আলাদা পদ্ধতিতে যুক্ত হয়, যা বোঝায় রিসেপ্টরটি বিভিন্ন ধরনের মিষ্টিজাত উপাদান চিহ্নিত করতে পারে। TAS1R3 সরাসরি মিষ্টি অণুর সঙ্গে যুক্ত না হলেও রিসেপ্টরের গঠন ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

“এটি আমাদের স্পষ্ট করে বোঝাতে শুরু করেছে যে রিসেপ্টরটি কীভাবে কাজ করে,” বলেন ফিলাডেলফিয়াভিত্তিক স্বাদ বিশ্লেষণ সংস্থা Opertech Bio-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা কাইল পামার।

এই গঠনগত বিশ্লেষণ সাহায্য করতে পারে বোঝার ক্ষেত্রে কেন কেউ কেউ মিষ্টির স্বাদ অন্যদের চেয়ে বেশি অনুভব করেন। ফরাসি গবেষক লোয়িক ব্রিয়াঁ ও তার সহকর্মীরা এই রিসেপ্টরে থাকা প্রাকৃতিক জেনেটিক পরিবর্তনগুলো নিয়ে কাজ করছেন। এখন রিসেপ্টরের গঠন জানার ফলে এই পরিবর্তনগুলো কীভাবে কাজের ব্যাঘাত ঘটায় তা বিশ্লেষণ করা সহজ হবে।

চীনের ছিলু ইউনিভার্সিটির গবেষক বো লিউর মতে, একই পদ্ধতি ব্যবহার করে ভবিষ্যতে উমামি স্বাদের রিসেপ্টরের গঠনও উন্মোচিত হতে পারে।

স্বাদের চমক

এই রিসেপ্টরের গঠন জানার ফলে খাদ্য রসায়নবিদরা এমন ক্যালরিমুক্ত স্যুইটনার তৈরি করতে পারবেন, যা বর্তমান বিকল্পগুলোর তুলনায় নিরাপদ এবং আরো স্বাদযুক্ত হবে।

এছাড়া, এই গঠন কাজে লাগিয়ে এমন যৌগ তৈরি করা সম্ভব হতে পারে, যা প্রাকৃতিক চিনির প্রতি রিসেপ্টরের সংবেদনশীলতা বাড়ায়। এতে স্বাদে ছাড় না দিয়েই চিনি কম খাওয়ার দিকে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যাবে—একধরনের ‘মলিকিউলার ম্যাজিক’, যা স্থূলতা ও ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে।

লেখক: সাদিয়া ইসলাম বর্ষা

রেফারেন্স: *DOI: 10.1016/j.cell.2025.04.021*

Lillian King/Getty Image

প্রকৃতিতে আসল নীল রঙ খুঁজে পাওয়া সত্যিই বেশ কঠিন, তাই না? এর পেছনে রয়েছে এক মজার কারণ, নীল রঙ যেন এক 'হাই-মেইনটেন্যান্স' তারকা! কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদকে নীল দেখাতে হলে, তাকে করতে হয় এক জটিল আণবিক জাদু। তাদেরকে কম শক্তির আলোক তরঙ্গ শোষণ করে কেবল বেশি শক্তির নীল তরঙ্গ প্রতিফলিত করতে হয়। অনেকটা আলোর তরঙ্গ দিয়ে এক দুরূহ খেলা খেলার মতো ব্যাপার।

এই প্রক্রিয়াটি এতটাই জটিল যে প্রকৃত নীল রঞ্জক (pigment) প্রকৃতিতে প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু চিন্তার কিছু নেই—প্রকৃতি যে খুবই বুদ্ধিমতী! সে কোনো না কোনো উপায় খুঁজে নেয়। তাই কিছু গাছপালা ও প্রাণী আশ্রয় নেয় দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টিকারী অপটিক্যাল কৌশলের যাকে ইংরেজি বলে optical "hacks"। এই বিভ্রমের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় নীল রঙের মায়াবী আভা।

নীল রঙ তৈরির কৌশল

যেসব প্রাণীকে আমাদের চোখে নীল দেখায়, তাদের বেশিরভাগের শরীরেই আসলে কোনো নীল রঞ্জক নেই। তারা নির্ভর করে এক ধরনের ভিন্ন পদার্থবিজ্ঞানের পদ্ধতির ওপর—যা বলা হয় গঠনগত রঙ বা structural coloration। এ ক্ষেত্রে তাদের অণুবীক্ষণিক কাঠামো এমনভাবে তৈরি থাকে যে তা আলোর সাথে ইন্টার‍্যাক্ট করে নীল রঙের আভা তৈরি করে।

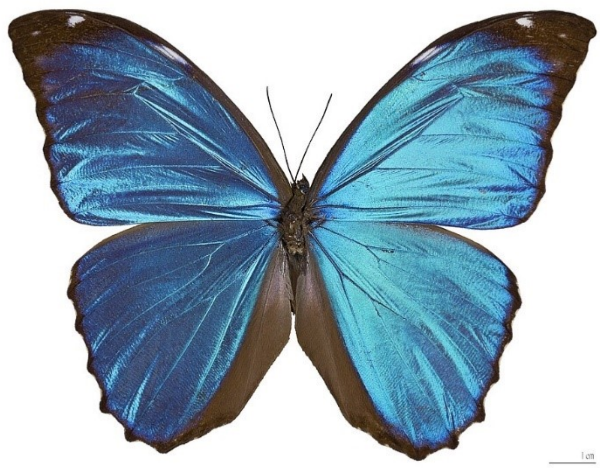

নীল রঙের Morpho menelaus huebneri প্রজাপতি (Didier Descouens/Wikimedia)

উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক ব্লু মরফো (*Morpho menelaus*) প্রজাপতির কথা। এর ডানায় কোনো নীল রঞ্জক নেই। বরং, ডানার সূক্ষ্ম ন্যানোস্ট্রাকচার্ড খাঁজগুলো লাইট ইন্টারফেইস (light interference) নামের এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় সব রঙের আলো একে অপরকে বাতিল করে দিয়ে নীল আলো প্রতিফলিত করে। ফলে আমরা এর রঙ উজ্জ্বল দৃষ্টিনন্দন নীল দেখতে পাই। এটা যে লাইট ইন্টারফেইসের কারসাজি সেটার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় এর কোন কোণ থেকে দেখলে। আপনি কোন কোণ থেকে

দেখছেন তার উপর ভিত্তি করে রঙেও সামান্য পরিবর্তন আসে।

Jatin Sindhu/Wikimedia

একই কৌশল দেখা যায় ময়ূরের লেজে। ময়ূরের পেখমের চমৎকার নীল-সবুজ রঙ কোনো রঞ্জক দিয়ে নয়, বরং গঠনগত রঙের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। যদিও এর পালকের প্রকৃত রঙ বাদামী, তবু এই প্রক্রিয়ায় অণুবীক্ষণিক কাঠামো আলোর সাথে এমনভাবে ক্রিয়া করে যে তা আমাদের চোখে দৃষ্টিনন্দন নীল বা ফিরোজা মনে হয়।

পুরুষ Nessaea obrinus প্রজাপতি (Notafly/Wikimedia)

তবে, এই দৃষ্টিবিভ্রমের নিয়মের একটি ব্যতিক্রমও আছে। এই ব্যতিক্রমটি হলো ওবরিনা অলিভউইং (*Nessaea obrinus*) প্রজাপতি। এটিই একমাত্র প্রাণী, যার দেহে প্রকৃত নীল রঞ্জক রয়েছে। এটি প্রকৃতিতে খুবই বিরল। নীল রঙের অন্যান্য বেশিরভাগ প্রজাতিই সুসংগত বিক্ষেপণ (coherent scattering) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নীল রঙ তৈরি করে, যেখানে আলোর ইন্টর‍্যাক্টশনের ফলে নীল আভা সৃষ্টি হয়। ওবরিনা অলিভউইং প্রজাপতির রঙ উৎপন্ন হয় 'টেরোবিলিন' (pterobilin) নামক একটি বিরল জৈব যৌগ থেকে। এর Nessaea গণের অন্যান্য সদস্যরাও একই রঞ্জক থেকেই নীল রঙ পায়, যা জীবজগতে অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ঘটনা।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিবর্তনের ধারায় নীল রঞ্জক তৈরি করা যেহেতু খুবই কঠিন, তাই প্রকৃতি এই গঠনগত উপায়ে নীল রঙ তৈরির কৌশল বেছে নিয়েছে। শুধু নান্দনিকতার জন্য নয়, প্রাণীজগতে যোগাযোগ বা প্রজননের জন্য নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করার জন্যও এই কৌশল কাজে লাগে।

আকাশ ও সাগরের নীল

আকাশের নীল রঙও কিন্তু নীল রঞ্জকের কারণে নয়, এটি ঘটে আলোর বিক্ষেপণ (light scattering) প্রক্রিয়ার জন্য। সূর্যের আলো যখন বাতাসের ক্ষুদ্র কণাগুলোর উপর পড়ে, তখন তা বিক্ষিপ্ত হয়। নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট হওয়ায় তা অন্য রঙের আলোর চেয়ে বেশি বিক্ষিপ্ত হয়। আর তাই আমরা আকাশকে নীল দেখি। সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় সূর্যের আলো অনেক বেশি পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের চোখে পৌঁছায়। সেই দীর্ঘপথে নীল আলোর বেশিরভাগই বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, আর তখন লাল বা কমলা আলো চোখে পড়ে বেশি। তাই আমরা তখন আকাশকে লাল বা কমলা দেখি।

আর সাগরের নীল রঙ? অনেকেই ভাবেন, এটা আকাশের প্রতিফলন! কিন্তু বাস্তবতা হলো, পানি লাল আলো বেশি শোষণ করে। গভীর পানিতে লাল ও অন্যান্য দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষিত হয়ে যায়, ফলে কেবল নীল আলোই দৃশ্যমান থাকে। তাই গভীর সমুদ্র নীল দেখায়। অগভীর পানিতে আলো শোষণ কম হয়, তাই সেখানে পানি স্বচ্ছ বা হালকা নীল দেখায়।

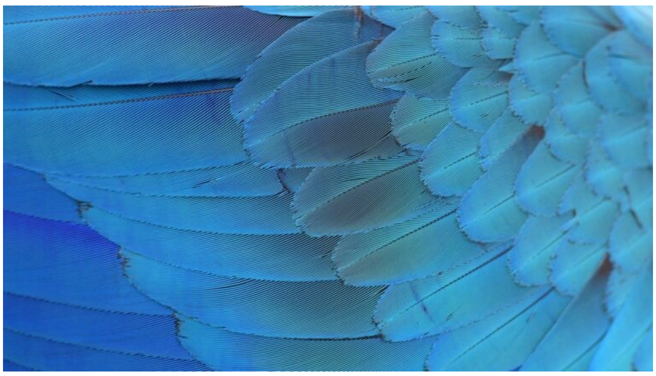

স্পিক্স ম্যাকাও (Cyanopsitta spixii)-এর মতো পাখির ঝকঝকে নীল পালকের রঙ রঞ্জক পদার্থ (pigment) থেকে আসে না বরং পালকের ভেতরের বিশেষ গঠন আলো ছড়িয়ে দিয়ে এই রঙ সৃষ্টি করে (Wera Rodsawang/Getty Images)

নীল রঙ এত বিরল কেন?

প্রকৃতিতে নীল রঙের বিরলতার পেছনে রয়েছে দুটি প্রধান কারণ; প্রতিফলন এবং রাসায়নিক গঠন। নীল আলো সঠিকভাবে প্রতিফলিত করা পদার্থবিদ্যাগতভাবে অত্যন্ত কঠিন একটি বিষয়। অন্যদিকে, নীল রঞ্জক রাসায়নিকভাবে তৈরি করাও বেশ জটিল। এই দুটি কারণ মিলেই নীল রঙকে প্রকৃতির এক রহস্যময়, দুর্লভ সৌন্দর্যে পরিণত করেছে।

এককথায়, প্রকৃতিতে আমরা যে নীল রঙ দেখি তার বেশিরভাগই হলো ক্ষুদ্র কাঠামো ও আলোর এক বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ বিভ্রম, আসল নীল রঞ্জক নয়।

প্রকৃতিতে নীল রঙের উপস্থিতি এক রহস্যময় সৌন্দর্য। এই রঙ যেন কেবল একটি দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য নয়, বরং আলো, পদার্থবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের এক নিখুঁত সমন্বয়ের ফল। প্রকৃতির নীল সৌন্দর্য আমাদের চোখকে ধোঁকা দেওয়া এক অভিনব কৌশল। প্রকৃত নীল রঞ্জকের অভাবে প্রাণীরা আলোর সাথে খেলা করে সৃষ্টি করেছে এক অনন্য জাদু, যা শুধু চোখে নয়, মনেও দাগ কাটে।

এই অপার সৌন্দর্যের পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানের চমকপ্রদ ব্যাখ্যা। আর সেটিই প্রমাণ করে, প্রকৃতি শুধু সৌন্দর্য রচনা করে না, সে তা করে এক অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের মাধ্যমে। তাই নীল রঙের বিরলতা কেবল একটি রঙের অভাব নয়—এ এক শিল্প, এক বিজ্ঞান, এক আশ্চর্য বিভ্রম; যা প্রকৃতির সৃজনশীলতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণগুলোর একটি।

লেখক: রামিছা আলী সালওয়া

শিক্ষার্থী, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

সমুদ্র

সমুদ্রের তলদেশের কতটুকু অংশ জানি?

গভীর সমুদ্রের তলদেশের মাত্র ০.০০১ শতাংশ মানুষ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছে, যা বেলজিয়ামের এক দশমাংশের সমান। অধিকাংশ তথ্য সীমিত কিছু দেশের প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের কাছেই কেন্দ্রীভূত, আর বিশাল অংশ এখনও একেবারেই অনাবিষ্কৃত।

আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে, মঙ্গলের পৃষ্ঠের চেয়ে পৃথিবীর সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কম। এবার এই দাবির পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন সমুদ্রবিজ্ঞানী ক্যাথরিন বেল ও তাঁর সহকর্মীরা। তাঁদের গবেষণা অনুযায়ী, গভীর সমুদ্রের তলদেশের যে অংশ বিজ্ঞানীরা সরাসরি দেখেছেন, তা মোট এলাকার মাত্র ০.০০১ শতাংশেরও কম — যা আয়তনে বেলজিয়ামের এক দশমাংশের সমান। এই গবেষণাটি ৭ মে, ২০২৫ এ *Science Advances* জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

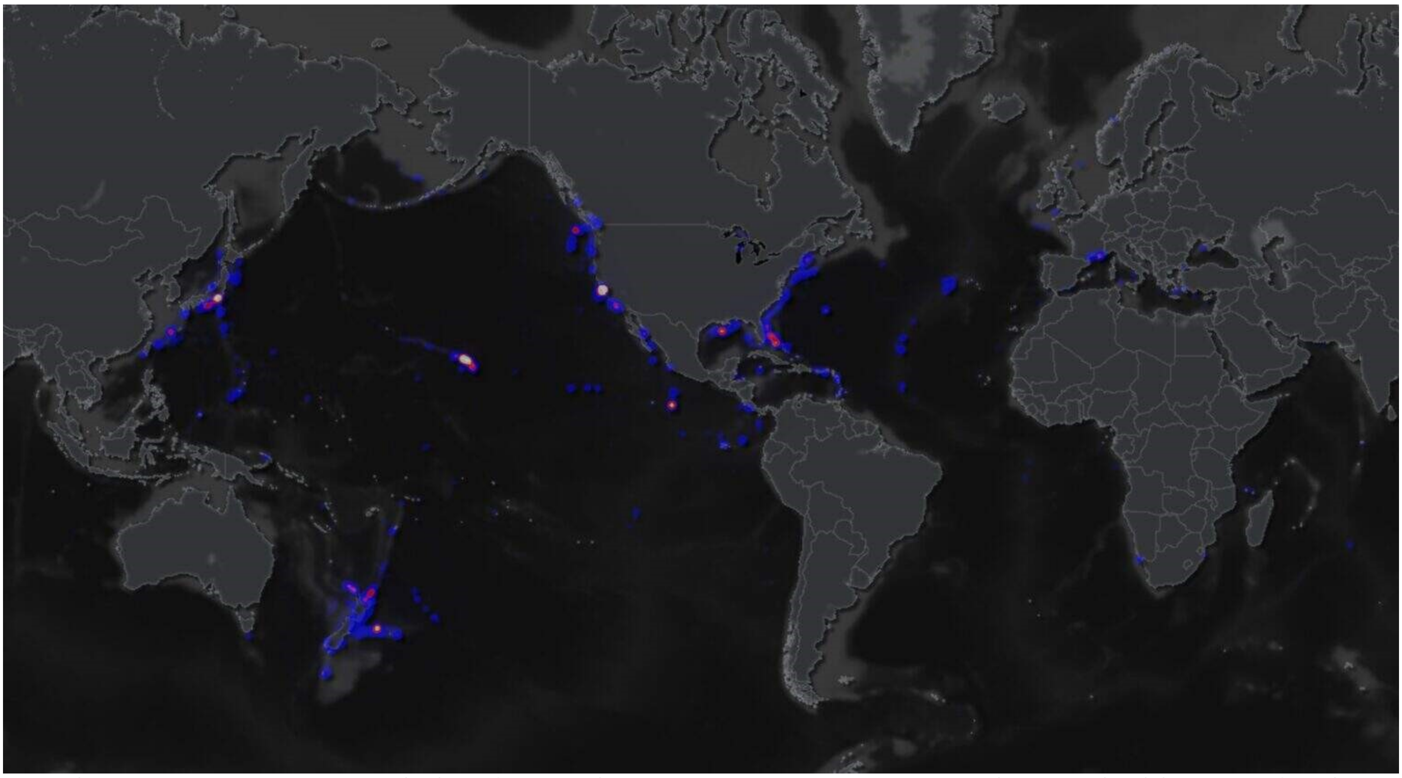

এই মানচিত্রে ১৯৫৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত পরিচালিত গভীর সমুদ্র অভিযানগুলোর অবস্থান দেখানো হয়েছে। এসব অভিযান মূলত কিছু নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত ছিল, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং নিউজিল্যান্ডের আশেপাশে (Ocean Discovery League)

গবেষণা দলটি প্রায় ৪৪,০০০টি গভীর সমুদ্র ডাইভের তথ্য সংগ্রহ করেছে, যেগুলো চালানো হয়েছিল মানুষচালিত যান কিংবা রিমোট-কন্ট্রোল বা স্বয়ংক্রিয় যান ব্যবহার করে। এসব তথ্য দিয়ে তাঁরা ডাইভ কার্যক্রমের একটি মানচিত্র তৈরি করেন। দেখা যায়, ডাইভগুলোর বেশিরভাগই হয়েছে কিছু নির্দিষ্ট দেশের জলসীমায় — বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও নিউজিল্যান্ডের কাছাকাছি। এছাড়াও, এই ডাইভগুলোর অনেক তথ্যই ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানির কাছে রয়ে গেছে, যা গবেষকদের জন্য অপ্রাপ্য। ফলে সমুদ্রের বিশাল অংশ এখনও শুধু সোনার (Soner) ব্যবহার করে প্রাথমিক মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে — যা খসড়া বটে। বেল বলেন, “ভারত মহাসাগর হলো সবচেয়ে কম অনুসন্ধান করা অঞ্চলের একটি।”

“গভীর সমুদ্রের তলদেশের মাত্র ০.০০১ শতাংশ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে”

ক্যাথরিন বেল হচ্ছেন রোড আইল্যান্ডের সন্ডার্সটাউনের Ocean Discovery League-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। এটি একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যারা সাশ্রয়ী রিমোট চালিত যান তৈরিতে সহায়তা করছে এবং সমুদ্রের গভীর তলদেশে অনুসন্ধানের জন্য ১০,০০০ সম্ভাব্য ডাইভ স্থানের তালিকা তৈরি করছে, যেন এর মাধ্যমে অনাবিষ্কৃত গভীর সমুদ্রের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক অংশ অনুসন্ধান করা যায়।

লেখক: সুলতানা লাবিবা

রেফারেন্স: *DOI: [10.1126/sciadv.adp8602](https://doi.org/10.1126/sciadv.adp8602)*

মতামত

উন্নত বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যাচ্ছে স্কুলে, আমরা কি প্রস্তুত?

২০১৮ সালে আইএমইডি-এর করা প্রকল্প মূল্যায়নে দেখা গেছে, আইসিটি শিক্ষকের মারাত্মক অভাবে বাংলাদেশ সরকারের দেয়া ৩০০ কোটি টাকার ডিজিটাল ডিভাইসের মধ্যে ৯৭ শতাংশ ডিভাইস অব্যবহৃত পড়ে আছে এবং ধুলা জমছে (a2i)

২০২৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে চীনের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)–ভিত্তিক বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে যাচ্ছে শি জিনপিং প্রশাসন। ইতিমধ্যে গাইডলাইনও প্রকাশ করেছে তারা। তাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ছোটবেলা থেকেই শিক্ষার্থীরা এআই প্রযুক্তির মৌলিক ধারণা ও ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে। এটি চীনের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলবে।

চীনের এই পদক্ষেপকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্রেও শুরু হয়েছে AI-ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর প্রস্তুতি। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ইতিমধ্যে প্রাথমিক স্তর থেকেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ঘোষণা দিয়েছে। লক্ষ্য একটাই—আগামী প্রজন্মকে ভবিষ্যতের প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বিত করে গড়ে তোলা এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত রাখা।

এই যুগান্তকারী উদ্যোগগুলো বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য হতে পারে এক চমৎকার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। যদিও বাংলাদেশের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখনো পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত সুবিধা নেই, তবুও ধাপে ধাপে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে AI বিষয় অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

শুরুতে দেশের প্রতিটি উপজেলায় কয়েকটি নির্বাচিত ও ডেডিকেটেড স্কুলে পরীক্ষামূলকভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক সংক্ষিপ্ত কোর্স চালু করা যেতে পারে। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে AI–বিষয়ক সচেতনতা, আগ্রহ ও দক্ষতা ধীরে ধীরে তৈরি হবে। পাশাপাশি প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার ও নিরাপত্তা সম্পর্কে জানার সুযোগও মিলবে।

যদি প্রাথমিক পর্যায়ে AI শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব নাও হয়, তাহলে অন্তত প্রতি সপ্তাহে ১ দিন বা মাসে ৬ ঘণ্টা করে হাতে-কলমে কম্পিউটার বিষয়ক মৌলিক শিক্ষা চালুর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এতে করে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিশুরাও আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়া পাবে এবং প্রযুক্তির জগতে প্রবেশের স্বপ্ন দেখার সুযোগ পাবে।

যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জানতে ও শিখতে পারবে-

1. কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের প্রাথমিক পরিচিতি,
2. সাধারণ টাইপিং এবং মাউসের ব্যাপার,
3. কীভাবে গুগল বা অন্য সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়,
4. ছবি আঁকা এবং লেখালেখি সফটওয়্যার ব্যবহার,
5. প্রাথমিক কোডিং এবং প্রোগ্রামিং ইত্যাদি।

পরিশেষে বলা যায় যে, এই ধরনের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে প্রযুক্তি ব্যবহার শেখানো। নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে তাদের মানিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা, এবং ভবিষ্যতের উদ্ভাবনী চিন্তাধারা ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করা।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত, একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী, দক্ষ ও জ্ঞানভিত্তিক মানবসম্পদ গড়ে তোলা, যারা শুধু চাকরির জন্য শিক্ষা নয়, বরং নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন, গবেষণা এবং বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।

লেখক: সিরাজুর রহমান

শিক্ষক, বিনগ্রাম উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিংড়া, নাটোর

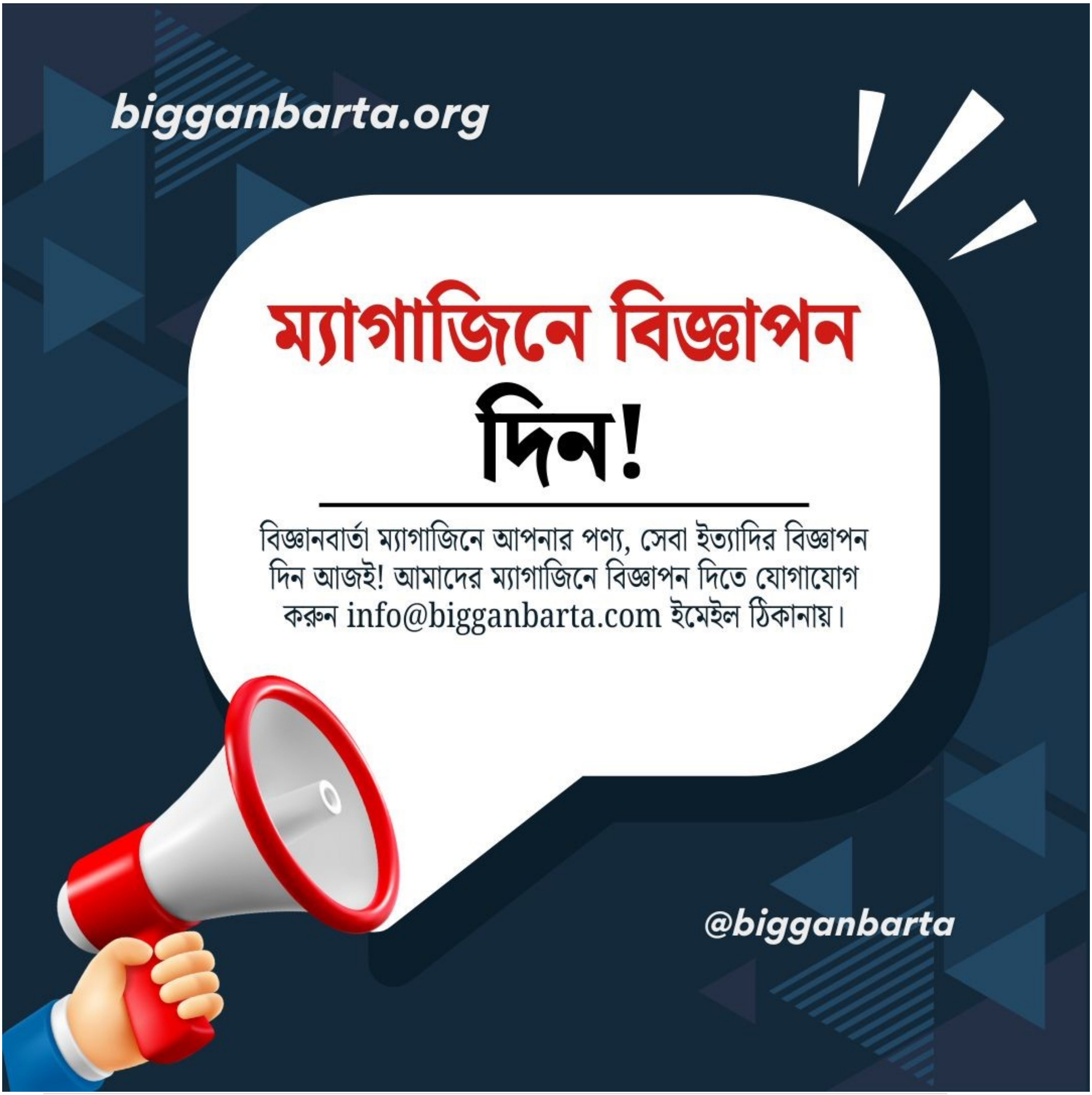

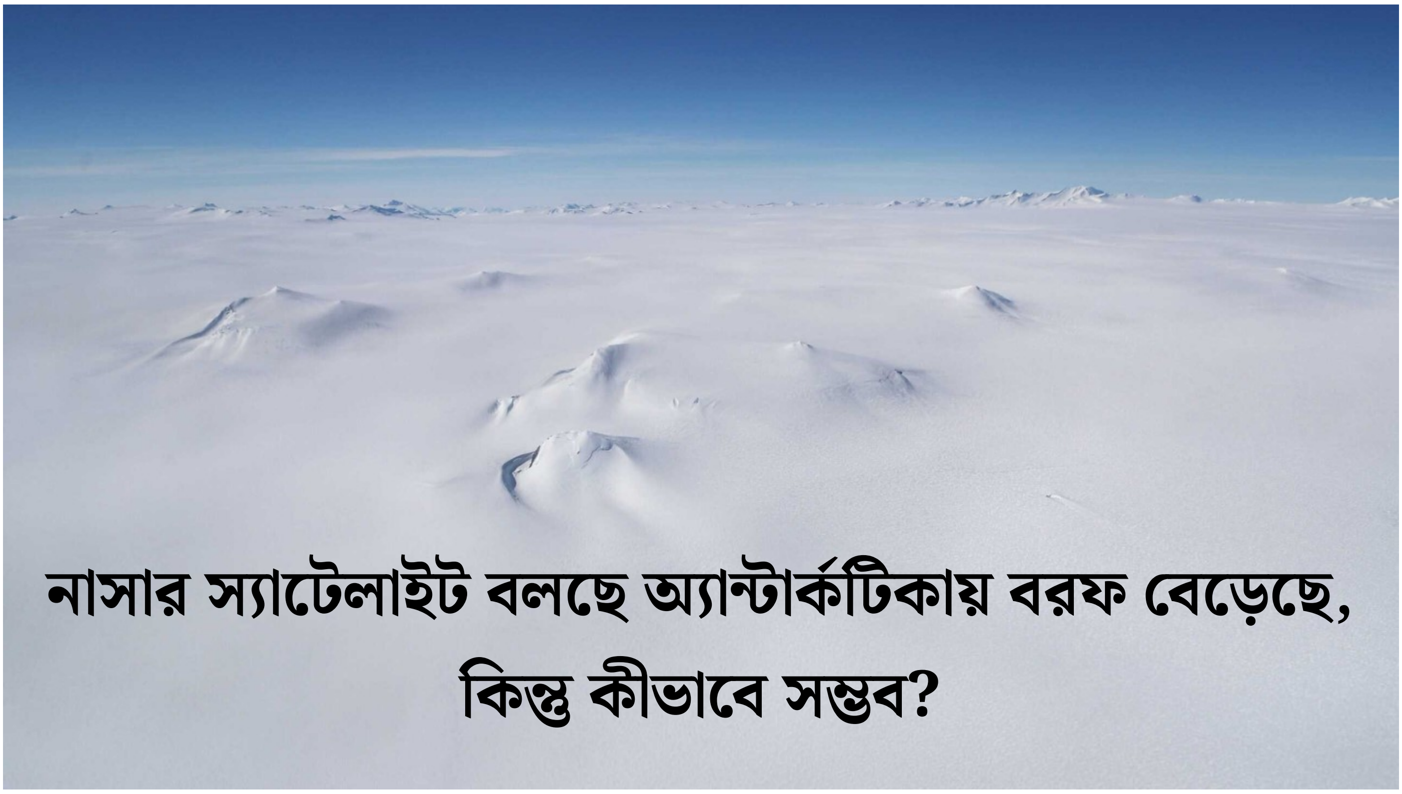

নাসার স্যাটেলাইট বলছে অ্যান্টার্কটিকায় বরফ বেড়েছে, কিন্তু কীভাবে সম্ভব?

Mario Tama/Getty Images

চীনের সাংহাইয়ের টংজি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা নাসার স্যাটেলাইট তথ্য ব্যবহার করে গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অ্যান্টার্কটিকার বরফচাদরের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেছেন। যদিও সামগ্রিকভাবে অ্যান্টার্কটিকায় উল্লেখযোগ্য হারে বরফ হ্রাস পেয়েছে, তবে দেখা গেছে ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে কিছু বরফ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে এটি এই অর্থে নয় যে বৈশ্বিক উষ্ণতা বা জলবায়ু পরিবর্তন হঠাৎ থেমে গেছে। এটি অনেকটা যেন একটি লম্বা স্কি ঢালের শেষে হালকা একটি উঁচু ঢালের মতো—অ্যান্টার্কটিকার বরফচাদরের তথ্যকে গ্রাফে ফেলে এমনই একটি চিত্র পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক বরফ বৃদ্ধি পেলেও, তা গত ২০ বছরের বরফ হ্রাসের ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ার ধারের কাছেও না।

এই বরফ বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে বিশেষ ধরনের আবহাওয়াজনিত পরিবর্তনকে দায়ী করা হয়েছে, যেখানে অ্যান্টার্কটিকায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত (তুষার ও কিছুটা বৃষ্টিসহ) হয়েছে, যার ফলে বেশি বরফ জমেছে। তবে এই বরফ বৃদ্ধি ধারা ২০২৪ সালের শুরুতেই কমে এসেছে। নাসার ২০২৫ সালের শুরুতে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বরফের পরিমাণ ২০২০ সালের মতোই রয়েছে।

অ্যান্টার্কটিকার বরফচাদর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বরফ স্তূপ। এটি পুরো যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বড় এবং পরিবেশবিষয়ক বেসরকারি সংস্থা Antarctic and Southern Ocean Coalition এর তথ্যমতে এটি বিশ্বের ৯০% বিশুদ্ধ পানি ধারণ করে। অ্যান্টার্কটিকার চারপাশে রয়েছে সামুদ্রিক বরফ (বরফে পরিণত হওয়া সমুদ্রের পানি), যা শীতে বিস্তৃত হয় এবং গ্রীষ্মে উপকূলে সরে আসে।

২০২৫ সালের মার্চ ১৯ তারিখে *Science China Earth Sciences* জার্নালে প্রকাশিত সর্বশেষ গবেষণাটি নাসার GRACE এবং GRACE Follow-On স্যাটেলাইট থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করেছে। এই স্যাটেলাইটগুলো ২০০২ সাল থেকে অ্যান্টার্কটিকার বরফচাদর পর্যবেক্ষণ করছে। বরফ গলে গেলে সমুদ্রে পানি যোগ হয়, যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ, তাই এই পরিবর্তন জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্যাটেলাইটের তথ্য অনুযায়ী, ২০০২ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত টানা বরফ হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে। এমনকি এই সময়ের শেষ ভাগে বরফ হ্রাসের গতি বেড়ে গিয়েছিল। ২০০২ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বছরে গড়ে ৮১ বিলিয়ন টন বরফ

হারালেও, ২০১১ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে সেই হার বেড়ে দাঁড়ায় বছরে গড়ে ১৫৭ বিলিয়ন টনে।

তবে এই ধারা ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে কিছুটা বদলায়—এই সময়ে প্রতি বছর গড়ে ১১৯ বিলিয়ন টন বরফ বাড়ে। পূর্ব অ্যান্টার্কটিকার চারটি হিমবাহেও বরফ হ্রাসের পরিবর্তে বরফ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।

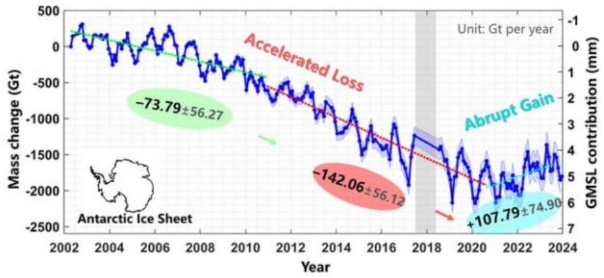

Science China Press

"এটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়," বলেন যুক্তরাজ্যের নর্থামব্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞানী টম স্লেটার, যিনি এই গবেষণায় অংশ নেননি। তিনি জানান, "উষ্ণ জলবায়ুতে বায়ুমণ্ডলে বেশি আর্দ্রতা ধারণ করা সম্ভব, ফলে তীব্র তুষারপাতের সম্ভাবনা বেড়ে যায়—যা পূর্ব অ্যান্টার্কটিকায় বরফ বৃদ্ধির কারণ হয়েছে।"

২০২৩ সালের একটি গবেষণায় ২০২১-২২ সালের অ্যান্টার্কটিকার অভূতপূর্ব বরফ বৃদ্ধির বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছিল। সেই গবেষণায়ও উল্লেখ করা হয়, বেশি বৃষ্টিপাতের কারণেই বরফ বৃদ্ধি ঘটেছে। নতুন গবেষণায় বলা হয়েছে, এই প্রবণতা অন্তত ২০২৩ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল।

স্লেটার জানান, গবেষকরা মনে করছেন এই বরফ বৃদ্ধি সাময়িক। "অ্যান্টার্কটিকার স্থলভিত্তিক বরফ হ্রাস মূলত অন্যান্য অঞ্চলের হিমবাহ থেকে আসে, যেগুলো গলে গিয়ে উষ্ণ মহাসাগরে প্রবাহিত হচ্ছে," তিনি বলেন আরো বলেন "এই প্রক্রিয়া এখনো চলছে। সাম্প্রতিক তুষারপাত সাময়িকভাবে এই ক্ষতি পূরণ করলেও, এটি স্থায়ী কোনো পরিবর্তন নয়।"

"সম্প্রতি অ্যান্টার্কটিকায় বরফের পরিমাণ কিছুটা বাড়লেও, মহাদেশটি দীর্ঘ সময় ধরে যে হারে দ্রুতগতিতে বরফ হারাচ্ছে, সেটি পুষিয়ে নেওয়ার মতো নয়"

জলবায়ু পরিবর্তন মানে এই নয় যে পৃথিবীর সব জায়গা সমান হারে উষ্ণ হবে। একক কোনো অঞ্চল দিয়ে পুরো বৈশ্বিক উষ্ণতার চিত্র বোঝা যায় না। এমনিতেও অ্যান্টার্কটিকার তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল, বিশেষ করে আর্কটিক অঞ্চলের তুলনায়, যেখানে উষ্ণতা চার গুণ দ্রুত বেড়েছে। সমুদ্র বরফের ক্ষেত্রেও অ্যান্টার্কটিকা আগে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তা পরিবর্তন হচ্ছে।

২০২৩ সালে অ্যান্টার্কটিকার সমুদ্র বরফ রেকর্ড সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছায়। গবেষকরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তন ছাড়া এমন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। একই সময়ে, বৈশ্বিক সমুদ্র বরফের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে রেকর্ড সর্বনিম্ন বা তার কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে, এবং বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রাও একইভাবে রেকর্ড বা প্রায় রেকর্ড উচ্চতায় রয়েছে।

২০১৫ সালে বিশ্বনেতারা প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যার লক্ষ্য ছিল বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে সীমাবদ্ধ রাখা (সর্বোচ্চ ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস)। কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রা এখন হুমকির মুখে—ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপারনিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের তথ্য অনুযায়ী, এপ্রিল ২০২৫ ছিল গত ২২ মাসের মধ্যে ২১তম মাস, যেখানে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস সীমা অতিক্রম হয়েছে।

লেখক: তানভীর রানা রাব্বি

পদার্থবিজ্ঞান

সীসাকে সোনায় পরিণত করলেন বিজ্ঞানীরা

সীসার বিমের সংঘর্ষে তৈরি হয় দ্রুতগতিসম্পন্ন, স্বল্পস্থায়ী সোনার আয়ন। এই প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে বুঝতে পারলে পার্টিকেল অ্যাক্সিলারেটর পরীক্ষাগুলোকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে।

Sunny Young/Unsplash

মধ্যযুগীয় আলকেমিরা স্বপ্ন দেখত সীসাকে সোনায় রূপান্তর করার। কিন্তু আজ আমরা জানি, সীসা ও সোনা দুটি ভিন্ন মৌল এবং কেমিস্ট্রির কোন কৌশলেই একটিকে অন্যটিতে রূপান্তর করা সম্ভব না।

তবে আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের জানায়, সীসা ও সোনার পরমাণুর মূল পার্থক্য হল এর প্রোটনের সংখ্যা। সীসার পরমাণুতে সোনার তুলনায় মাত্র তিনটি প্রোটন বেশি থাকে। তাহলে কি শুধু এই তিনটি প্রোটন সরিয়েই সীসাকে সোনায় রূপান্তর করা সম্ভব? হ্যাঁ, তা সম্ভব। তবে ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়।

সুইজারল্যান্ডের লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে (LHC) ALICE নামক এক্সপেরিমেন্টে বিজ্ঞানীরা সীসার পরমাণুগুলোকে আল্ট্রা-হাই স্পিডে একে অপরের সাথে সংঘর্ষ করিয়ে বিগ ব্যাং-এর পরবর্তী মুহূর্তের পরিস্থিতি অনুকরণ করার চেষ্টা করেন। সেই প্রচেষ্টায় তারা দুর্ঘটনাবশত অতি সামান্য পরিমাণে সোনা তৈরি করতে সক্ষম হন। ৭ মে, ২০২৫ *Physical Review C* জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে গবেষক দল জানিয়েছে যে, ২০১৫ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে LHC-তে সংঘটিত সংঘর্ষগুলোর ফলে প্রায় ৮৬ বিলিয়ন সোনার নিউক্লিয়াস তৈরি হয়েছে। মাত্র ১ গ্রামের ২৯ ট্রিলিয়ন ভাগের এক ভাগ!

স্বর্ণের এই পরমাণুগুলো প্রায় ১ মাইক্রোসেকেন্ডের মতো সময় টিকে ছিল, তারপর কোথাও ধাক্কা খেয়ে অথবা ভেঙে গিয়ে অন্যান্য কণায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

কীভাবে সম্ভব?

প্রোটন থাকে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে, এবং যেহেতু প্রোটনের বৈদ্যুতিক চার্জ রয়েছে, তাই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা সেগুলোকে টানা বা ঠেলা যায়। কিন্তু নিউক্লিয়াস একত্রে বাঁধা থাকে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বল দ্বারা, যার নাম স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স বা সবল নিউক্লিয় বল। এই বল অতিক্রম করতে হলে বজ্রপাতের চেয়েও প্রায় দশ লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োজন।

এই শক্তিশালী ক্ষেত্র তৈরি করতে বিজ্ঞানীরা সীসার নিউক্লিয়াসকে প্রায় আলোর গতিবেগে একে অপরের দিকে গুলি করে পাঠান।

যখন সীসার নিউক্লিয়াস একে অপরকে সরাসরি ধাক্কা দেয়, তখন তারা স্ট্রং ফোর্সের অধীনে একদম গুঁড়িয়ে যায়। কিন্তু অনেক সময় তারা একে অপরকে শুধু ছুঁয়ে যায়, এবং তখন কেবল ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স কাজ করে।

একটি বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত বস্তু থেকে দূরত্ব যত কম, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তত বেশি। ফলে যখন একটি সীসার নিউক্লিয়াস আরেকটির খুব কাছ দিয়ে যায়, তখন তাদের মাঝে তৈরি হয় ভয়ঙ্কর শক্তিশালী একটি ক্ষেত্র। এই পরিবর্তনশীল ক্ষেত্র নিউক্লিয়াসগুলোকে কাঁপিয়ে দেয়, এবং মাঝে মাঝে কিছু প্রোটন ছিটকে বেরিয়ে আসে। যদি ঠিক তিনটি প্রোটন ছিটকে পড়ে, তাহলে সেই সীসার নিউক্লিয়াসটি সোনায় রূপান্তরিত হয়।

সোনা যে তৈরি হয়েছে তার প্রমাণ

কিন্তু তাহলে কীভাবে বোঝা যায় যে সীসা থেকে সোনা হয়েছে? ALICE এক্সপেরিমেন্টে বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন জিরো-ডিগ্রি ক্যালোরিমিটার নামের বিশেষ ডিটেক্টর, যা প্রোটন গুনে ফেলতে পারে।

তারা সরাসরি সোনার নিউক্লিয়াস দেখতে পান না, তবে প্রোটনের হিসাব থেকেই তারা বোঝেন যে সোনা তৈরি হয়েছে। গণনা অনুযায়ী, প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৮৯,০০০টি সোনার নিউক্লিয়াস তৈরি হয়। তারা থেলিয়াম (একটি প্রোটন কম) ও পারদ (দুটি প্রোটন কম) তৈরির ঘটনাও নজরে রাখেন।

যখন একটি সীসার নিউক্লিয়াস থেকে প্রোটন খসে পড়ে, তখন সেটি আর LHC-এর ভ্যাকুয়াম রিংয়ে নিখুঁতভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে না। কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের মধ্যেই তা দেয়ালে ধাক্কা মারে। এর ফলে কোলাইডারের বিম ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই এই "সোনার উৎপাদন" বিজ্ঞানীদের কাছে লাভজনক নয়, বরং একটি বিরক্তির কারণ।

প্রতিবারই যখন LHC-তে সীসার বীম একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন স্বর্ণ তৈরি হয়। তবে ALICE একমাত্র পরীক্ষা যেখানে এই প্রক্রিয়াটি শনাক্ত করার মতো ডিটেক্টর রয়েছে।

"এক্সপেরিমেন্টে বড় সোনার নাগেট তৈরি হয় নি তবে সীসা আয়নের বিমে থাকা কিছু কণা প্রায় এক মাইক্রোসেকেন্ডের জন্য সোনায় রূপান্তরিত হয়েছিল"

নিউ ইয়র্কের স্টনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী জিয়াংইয়ং জিয়া জানান, CERN-এর আরেকটি অ্যাক্সিলারেটর SPS-এ ২০০২ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সীসা থেকে স্বর্ণে রূপান্তরের প্রমাণ দেখা গিয়েছিল। তবে এই এক্সপেরিমেন্ট বেশি শক্তিতে করায় স্বর্ণ তৈরির সম্ভাবনাও অনেক বেশি, এবং পর্যবেক্ষণগুলোও অনেক পরিষ্কার; যেটা আগে ছিলো না।

CERN-এর গবেষকরা স্বর্ণ তৈরি করে ব্যবসা শুরু করার কোনো পরিকল্পনা করছেন না, তবে তারা বলছেন, ফোটন কীভাবে নিউক্লিয়াস পরিবর্তন করতে পারে তা ভালোভাবে বোঝা গেলে LHC-এর কর্মক্ষমতা আরও উন্নত করা সম্ভব হবে।

এরকম দুর্ঘটনাজনিত আলকেমিকে বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের আরও বড় ও জটিল গবেষণাগুলোর ভিত্তি গঠনে সহায়ক হবে।

লেখক: জান্নাতুল মাইশা

রেফারেন্স:

DOI: 10.1103/PhysRevC.111.054906

অণুজীববিজ্ঞান

হাসপাতালের জীবাণু এবার প্লাস্টিকও খাচ্ছে!

গবেষণায় দেখা গেছে, হাসপাতালে সংক্রমণ ঘটানো Pseudomonas aeruginosa ব্যাকটেরিয়া একটি এনজাইমের মাধ্যমে প্লাস্টিক ভাঙতে পারে। এটি চিকিৎসা সরঞ্জাম নষ্ট করে রোগীর স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়াতে পারে।

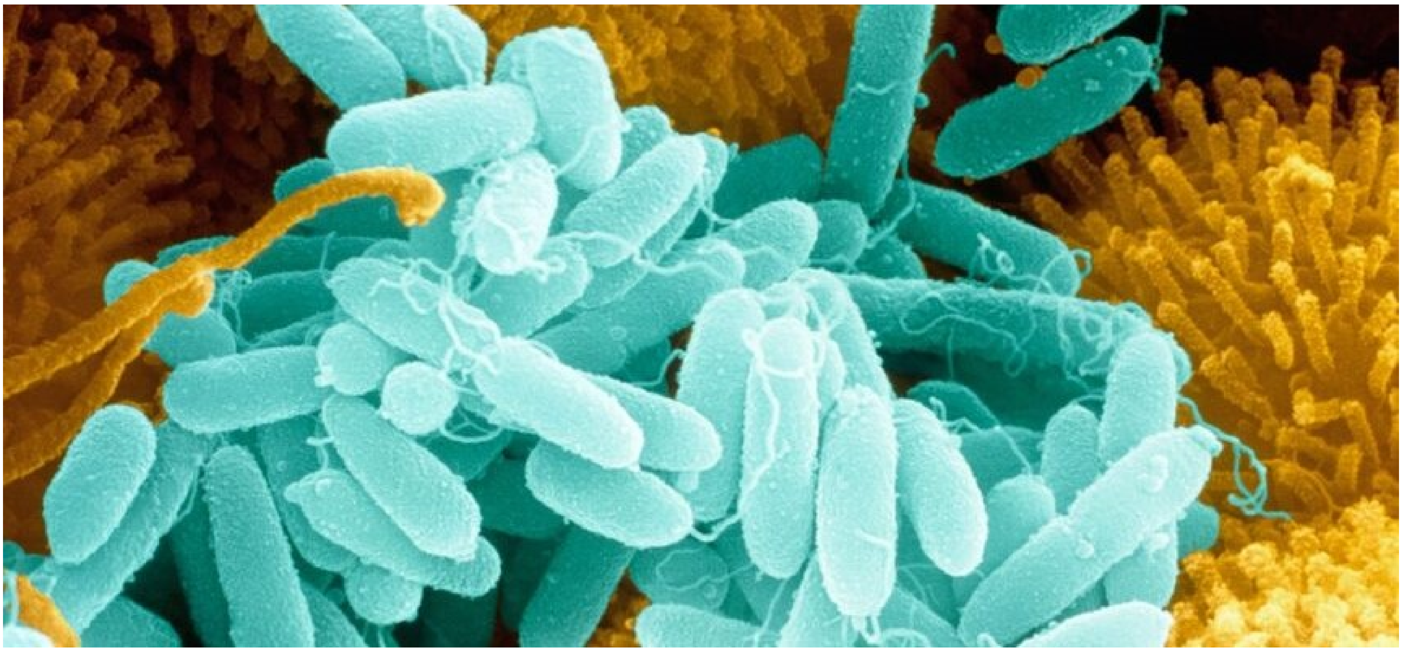

Juergen Berger/Science Photo Library

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, হাসপাতালে সংক্রমণের জন্য পরিচিত একটি ব্যাকটেরিয়া প্রজাতি প্লাস্টিক ভাঙতে সক্ষম। এই গবেষণাপত্রটি গত ৭ মে, ২০২৫ এ *Cell Reports* জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের গবেষকেরা *Pseudomonas aeruginosa* নামের একটি ব্যাকটেরিয়া প্রজাতির একটি স্ট্রেইন-এর মধ্যে একধরনের এনজাইম খুঁজে পেয়েছেন, যার নাম দিয়েছেন Pap1। এই ব্যাকটেরিয়াটি এক রোগীর ক্ষত থেকে সংগ্রহ করা হয়। গবেষণায় দেখা যায়, এই এনজাইমটি polycaprolactone (PCL) নামক একটি প্লাস্টিক ভেঙে ফেলতে পারে। PCL সাধারণত স্বাস্থ্যখাতে ব্যবহৃত হওয়া এক ধরনের প্লাস্টিক। এই প্লাস্টিকে বায়োডেগ্রেডেবল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

গবেষক রোনান ম্যাকার্থি বলেন, এতদিন পর্যন্ত শুধুমাত্র পরিবেশে থাকা ব্যাকটেরিয়াতেই প্লাস্টিক ভাঙার এনজাইম পাওয়া যেত। এখন হাসপাতালের পরিবেশে প্রচলিত প্যাথোজেনে এটি পাওয়া গেলে, বোঝা যায় কেন এই জীবাণুগুলো সেখানে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে। তিনি আরও বলেন, “যদি কোনো প্যাথোজেন প্লাস্টিক ভাঙতে পারে, তবে তা সেলাইয়ের সুতা, ইমপ্লান্ট, স্টেন্ট বা ক্ষত ঢাকার উপকরণগুলোর মতো প্লাস্টিকযুক্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম নষ্ট করতে পারে, যা রোগীর সুস্থতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।”

এনজাইমের পরীক্ষা ও প্রভাব

গবেষণায় ম্যাকার্থি এবং তাঁর দল Pap1 এনজাইমের জিনটি *Escherichia coli* ব্যাকটেরিয়াতে প্রতিস্থাপন করেন। তখন দেখা যায়, সেই ব্যাকটেরিয়া PCL প্লাস্টিক ভেঙে ফেলতে পারে। ক্ষত থেকে সংগৃহীত *P. aeruginosa*-ও একইভাবে PCL ভেঙে ফেলে। তবে যখন তারা Pap1 এনজাইমের জিন মুছে ফেলে সেই ব্যাকটেরিয়াতে মিউটেশন ঘটান, তখন ব্যাকটেরিয়াটি আর প্লাস্টিক ভাঙতে পারেনি।

গবেষকেরা আরও দেখেছেন, এই এনজাইম ব্যাকটেরিয়ার বায়োফিল্ম তৈরির পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে, যদি ব্যাকটেরিয়াটি প্লাস্টিকের সংস্পর্শে আসে। বায়োফিল্ম যত

বেশি, অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতাও তত বেশি—ফলে এর চিকিৎসাও কঠিন হয়ে পড়ে।

তারা আরও পরীক্ষা করেন মথের লার্ভা (*Galleria mellonella*) ব্যবহার করে। দেখা যায়, যখন শরীরে PCL ইমপ্লান্ট থাকে, তখন ব্যাকটেরিয়াটি বেশি ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। তবে যদি ব্যাকটেরিয়ায় Pap1 এনজাইম না থাকে, তাহলে ইমপ্লান্ট থাকুক বা না থাকুক, মথের বেঁচে থাকার হার একই রকম ছিল।

ভবিষ্যতের হুমকি

অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি সিডনির গবেষক স্টিভেন জর্ডজেভিচ বলেন, এই গবেষণাটি *P. aeruginosa* এবং ESKAPEE নামে পরিচিত ছয়টি অতি-সংক্রামক ব্যাকটেরিয়ার হুমকি সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে। তিনি বলেন, "এই জীবাণুগুলো হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রে দীর্ঘদিন টিকে থাকে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে তোলে।" গবেষণায় আভাস মিলেছে, এই ESKAPEE জীবাণুগুলোর আরও অনেকগুলো প্লাস্টিক ভাঙার ক্ষমতা থাকতে পারে—যা স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য চিন্তার বিষয়।

ম্যাকার্থি বলেন, এখন তাঁরা এমন পরীক্ষার পদ্ধতি তৈরি করছেন যা এই ধরনের প্যাথোজেনের প্লাস্টিক ভাঙার ক্ষমতা শনাক্ত করতে পারবে।

লেখক: অরুণিমা তানহা

রেফারেন্স: *DOI: [10.1016/j.celrep.2025.115650](https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.115650)*

প্রযুক্তি

গুগলের আলফাইভলভ

গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষণা ল্যাবরেটরি DeepMind, AlphaEvolve নামরর একটি নতুন এআই এজেন্ট তৈরি করেছে, যা সাধারণ লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলের সৃজনশীলতা ও অ্যালগরিদম বিশ্লেষণ ক্ষমতা ব্যবহার করে গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের জটিল সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম। এটি Google-এর নিজস্ব প্রযুক্তি উন্নয়নেও ইতিমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

DeepMind

গুগলের গবেষণা প্রতিষ্ঠান DeepMind এক নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা AlphaEvolve উদ্ভাবন করেছে, যা গণিত ও কম্পিউটার বিজ্ঞানের জটিল সমস্যার সৃজনশীল সমাধান দিতে সক্ষম।

এই AlphaEvolve সিস্টেমটি তৈরি করা হয়েছে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLM)–এর সৃজনশীলতা এবং সেই মডেলের প্রস্তাবিত সমাধানগুলো যাচাই ও উন্নত করতে সক্ষম এমন অ্যালগরিদমের সমন্বয়ে। নতুন এই এআই টুলটি গত ১৪ মে, ২০২৫ এ DeepMind-এর [একটি হোয়াইট](#) পেপারে বর্ণনা করা হয়।

জার্মানির এরল্যাঙ্গেনের ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউটের Artificial Scientist Lab–এর প্রধান মারিও ক্রেন বলেন, "এই গবেষণাপত্রটি অত্যন্ত চমকপ্রদ। আমার মতে, AlphaEvolve-ই প্রথম কার্যকর উদাহরণ, যেখানে সাধারণ উদ্দেশ্যের LLM ব্যবহার করে নতুন কোনো আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।"

শুধু থিয়োরিটিক্যাল সমস্যা নয়, DeepMind ইতোমধ্যেই এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করে নিজেদের বাস্তবভিত্তিক ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যা সমাধানে সফল হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান পুশমীত কোহলি।

AlphaEvolve-এর সহায়তায় তারা পরবর্তী প্রজন্মের টেনসর প্রসেসিং ইউনিট (TPU) উন্নত করতে পেরেছে এবং গুগলের বিশ্বব্যাপী কম্পিউটিং ক্ষমতা আরও কার্যকরভাবে ব্যবহারের উপায় বের করেছে, যার ফলে ০.৭% রিসোর্স সাশ্রয় হয়েছে। কোহলি জানান, "এর প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।"

সাধারণ উদ্দেশ্যের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

গবেষক মারিও ক্রেন জানান, এ পর্যন্ত বিজ্ঞানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সফল প্রয়োগ (যেমন [AlphaFold](#)) মূলত নির্দিষ্ট কাজের জন্য তৈরি এলগরিদমের ওপর নির্ভর করত। কিন্তু AlphaEvolve একটি জেনারেল-পারপাস এআই, যা LLM-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোড তৈরি করে সমস্যার সমাধান করতে পারে।

DeepMind AlphaEvolve-কে "এজেন্ট" হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে, কারণ এটি একাধিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তবে এটি বিজ্ঞান প্রক্রিয়ার সেই অংশে কাজ করে, যেখানে অন্য এজেন্টিক সিস্টেমগুলো সাধারণত তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় বা হাইপোথিসিস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

AlphaEvolve গঠিত হয়েছে গুগলের Gemini LLM এর ওপর ভিত্তি করে। প্রতিটি টাস্ক ব্যবহারকারী একটি প্রশ্ন এবং ইন্সট্রাকশন ইনপুট দিয়ে শুরু হয়, যার জন্য এলএলএম শত শত বা হাজার হাজার পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়। এরপর "ইভালুয়েটর" অ্যালগরিদম এই পরিবর্তনগুলো বিশ্লেষণ করে কোনটি ভালো সমাধান তা নির্ধারণ করে। সেই অনুযায়ী নতুন ও আরও কার্যকর সমাধান উদ্ভাবিত হয়।

গবেষক মাতে বালোচ বলেন, "আমরা এই পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধানের অসংখ্য সম্ভাব্য পথ অনুসন্ধান করি।"

ফানসার্চ

AlphaEvolve-এর ভিত্তি হল ২০২৩ সালে DeepMind-এর তৈরি FunSearch পদ্ধতি, যা মানুষের তুলনায় আরও ভালোভাবে আনসলভড গাণিতিক সমস্যার সমাধান দিতে পেরেছিল। তবে AlphaEvolve বৃহত্তর কোড ও জটিল অ্যালগরিদম সামলাতে সক্ষম, এবং এটি বিজ্ঞানের অনেকগুলো ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে প্রয়োগযোগ্য।

DeepMind দাবি করেছে, AlphaEvolve এমন একটি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, যা কিছু ক্ষেত্রে ১৯৬৯ সালে ভল্কার স্ট্রাসেনের তৈরি দ্রুততম পদ্ধতির চেয়েও দ্রুত। এটি নিউরাল নেটওয়ার্ক ট্রেইনিং এ ব্যবহৃত হয়। বিস্ময়করভাবে, এই জেনারেল-পারপাস সিস্টেমটি ম্যাট্রিক্স সমস্যার জন্য বিশেষভাবে তৈরি AlphaTensor-এর চেয়েও ভালো ফল দেখিয়েছে।

বিজ্ঞানে নতুন দিগন্ত

ক্রেন বলেন, এই পদ্ধতিটি উন্নয়ন, অপ্টিমাইজেশন এবং সিমুলেশন ভিত্তিক যেকোনো বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করা যেতে পার। হতে পারে সেটা নতুন ধরনের মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ বা কোনো পদার্থ তৈরি।

তবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গাণিতিক গবেষক সাইমন ফ্রিডার মনে করেন, AlphaEvolve কেবল সেই ধরনের

সমস্যাতেই কার্যকর, যেগুলো কোডের মাধ্যমে সমাধানযোগ্য।

ওহাইও স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষক হুয়ান সান বলেন, DeepMind-এর বাইরে এটি কতটা কার্যকর তা বোঝার আগে, এই সিস্টেমটি বৃহৎ এবং ওপেন পরিসরে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। ফ্রিডার জানান, তিনি অপেক্ষা করছেন কবে গবেষকেরা এটির ওপেন সোর্স সংস্করণ তৈরি করবেন।

যদিও AlphaEvolve চালাতে AlphaTensor-এর তুলনায় কম শক্তি লাগে, তবে এটি এখনও এতটাই রিসোর্স-নির্ভর, যে DeepMind এটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে পারছে না।

তবুও প্রতিষ্ঠানটি আশা করছে, এই প্রযুক্তি প্রকাশের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা নিজেদের ক্ষেত্রেও AlphaEvolve ব্যবহার করতে আগ্রহী হবেন। কোহলি বলেন, “আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বেশি মানুষ যেন এর সুবিধা পেতে পারে।”

লেখক: ফাইজাহ্ সুলতানা

জীবাশ্ম বিজ্ঞান

সরীসৃপ বিবর্তনের সময়রেখা পরিবর্তন

স্ট্রেলিয়ায় পাওয়া ৩৫৫ মিলিয়ন বছর পুরোনো পায়ের ছাপ প্রমাণ করে যে সরীসৃপসদৃশ প্রাণীরা স্থলভূমিতে আগের ধারণার চেয়ে ৩.৫ কোটি বছর আগেই বিচরণ করছিল। এটি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিবর্তনের সময়রেখাকে নতুন করে লিখে দেয়। গবেষকরা ধারণা করছেন, টেট্রাপড ও অ্যামনিয়োটদের উৎপত্তি ডেভোনিয়ান যুগেই ঘটেছিল।

Martin Ambrozik

অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া জীবাশ্মের চিহ্ন সরীসৃপদের স্থলভূমিতে আবির্ভাবকে কমপক্ষে ৩.৫ কোটি বছর পেছনে সরিয়ে দিয়েছে, ফলে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নতুন করে লেখার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। উত্তর ভিক্টোরিয়ার ‘স্নোই প্লেইন্স ফরমেশন’-এ দুই অপেশাদার জীবাশ্মবিদ একটি ৩৫৫ মিলিয়ন বছর পুরোনো শিলা খণ্ডে এই প্রাচীন পায়ের/নখের চিহ্ন আবিষ্কার করেন, যা গোটা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করেছে।

এই ছাপগুলি কার্বনিফেরাস যুগের প্রারম্ভিক সময়ের, যা ইঙ্গিত দেয় যে সরীসৃপসদৃশ প্রাণীরা আগের ধারণার চেয়ে অনেক আগেই স্থলভূমিতে বিচরণ করছিল। এর আগে,

সবচেয়ে পুরোনো পরিচিত অ্যামনিয়োট (যে দলে সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী অন্তর্ভুক্ত) জীবাশ্ম প্রায় ৩২০ মিলিয়ন বছর আগের ছিল। নতুন গবেষণাপত্রটি গত ১৪ মে, ২০২৫ এ *Nature* জার্নালে প্রকাশিত হয়।

ফ্লিন্ডার্স ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক জন লং বলেন, "এটি পৃথিবীতে স্থলভূমিতে সরীসৃপসদৃশ প্রাণীদের চলাফেরার সবচেয়ে প্রাচীন প্রমাণ। এটি সরীসৃপ বিবর্তনের সময়রেখাকে আগের রেকর্ডের তুলনায় অন্তত ৩৫ মিলিয়ন বছর পিছিয়ে নিয়ে যায়।"

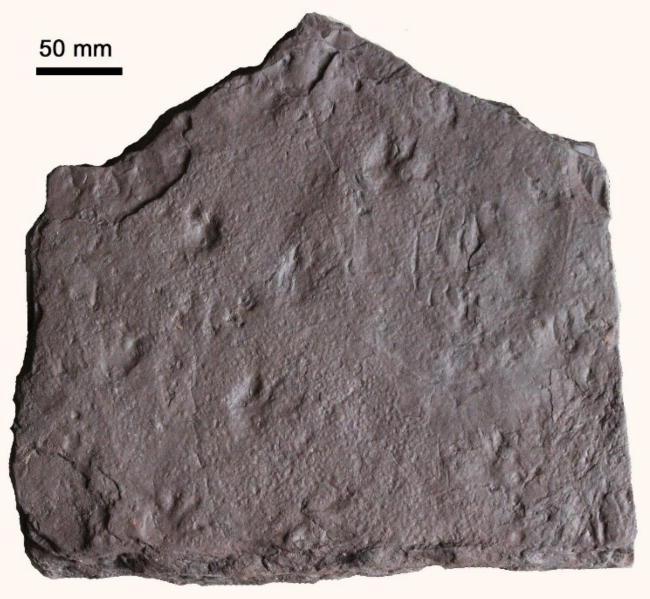

অস্ট্রেলিয়ার স্নোই প্লেইন্স ফরমেশন থেকে পাওয়া ৩৫৫ মিলিয়ন বছর পুরোনো পায়ের ছাপযুক্ত শিলা (Long et al.)

পায়ের ছাপগুলো সম্ভবত একটি ছোট, গোয়ান্না (গুইসাপ)-সদৃশ প্রাণীর ছিল। বিশ্লেষণে স্পষ্টভাবে নখরের ছাপ পাওয়া গেছে— যা প্রাচীন অ্যামনিয়োটদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। "সকল প্রাচীন অ্যামনিয়োটদের নখর ছিল, কিন্তু টেট্রাপডদের অন্য কোনো দলে তা প্রায় দেখা যায় না," বলেন উপসাল্লা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক পের এরিক আলবার্গ।

আরেক গবেষক ড. গ্রেজেগোর্জ নিয়েজভিয়েডজকি, জীবাশ্মটি প্রথম দেখে বিস্মিত হন। "মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই আমি স্পষ্ট নখরের ছাপ দেখতে পেলাম," তিনি বলেন। নখরের উপস্থিতি এবং পায়ের আকার দেখে গবেষকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছান, এটি একটি আদিম সরীসৃপের পায়ের ছাপ।

এই আবিষ্কারের তাৎপর্য বিশাল। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি নির্দেশ করে যে টেট্রাপড ও অ্যামনিয়োটদের গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলোর উৎপত্তি ডেভোনিয়ান যুগেই ঘটেছিল — যা এখন পর্যন্ত পাওয়া জীবাশ্মগুলোর চেয়ে অনেক আগের। এটি আরও ইঙ্গিত দেয় যে চারপেয়ে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বিবর্তন পূর্বে ধারণার চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে ঘটেছিল।

ফ্লিন্ডার্স ইউনিভার্সিটির ড. অ্যালিস ক্লেমেন্ট বলেন "জীবাশ্ম কঙ্কাল শুধু প্রাণীর গঠনের একটি দিক দেখায়। কিন্তু পায়ের ছাপ একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের গতির রেকর্ড রাখে — সেই প্রাণী কীভাবে ভূমির উপর চলাফেরা করছিল তা বলে দেয়।"

এই জীবাশ্ম শিলার বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে শিলাটির মধ্যে পাওয়া মাছের জীবাশ্মের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন পরিচিত স্থানের একই রকম প্রজাতির তুলনা করে, যার ফলে এটি প্রায় ৩৫৫ মিলিয়ন বছরের পুরোনো বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

"এই আবিষ্কার বিবর্তনের ইতিহাসের একটি অধ্যায় নতুন করে লিখে দিচ্ছে," বলেন লা ট্রোব ইউনিভার্সিটির ড. জিলিয়ান গারভে। "এটি একই সঙ্গে ইঙ্গিত দেয় যে অস্ট্রেলিয়া এবং গন্ডওয়ানার প্রাচীন মহাদেশে এখনও কত অজানা কিছু আবিষ্কৃত হওয়ার অপেক্ষায় আছে।"

এই আবিষ্কার শুধু সরীসৃপের উৎপত্তি সম্পর্কে দীর্ঘদিনের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করছে না, বরং জীবনের প্রারম্ভিক স্থলভাগের ইতিহাস উন্মোচনে অস্ট্রেলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও তুলে ধরছে।

লেখক: ইসরাত জাহান

রেফারেন্স: *DOI: [10.1038/s41586-025-08884-5](https://doi.org/10.1038/s41586-025-08884-5)*

মে মাসের সেরা বিজ্ঞানচিত্র

সূত্র: নেচার

মহাকাশময় দৃশ্য

চিলির সেরো টোলোলো ইন্টার-আমেরিকান অবজারভেটরি থেকে ফটোগ্রাফার পেত্র হোরালেক একসাথে চন্দ্রগ্রহণ ও তারাভরা গ্যালাক্সির দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করেন। তার তোলা এই ছবিটি ২০২৫ সালের 'মিল্কি ওয়ে ফটোগ্রাফার অব দ্য ইয়ার' প্রতিযোগিতার বিজয়ী ২৫টি ছবির একটি। হোরালেক বলেন, "পূর্ণগ্রহণের সময় আকাশ এতটাই চমকপ্রদ ছিল যে, চাঁদ অন্ধকার হয়ে গেলে মহিমান্বিত মিল্কিওয়ে, মৃদু রাশিচক্রীয় আলো এবং স্পষ্ট এয়ারগ্লো অনন্যভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।"

Petr Horálek

গানের পোকার ফসিল

Senckenberg

এই জীবাশ্মকৃত সিকেডা বা ঝিঁঝিঁপোকা ৪৭ মিলিয়ন বছর আগের, যা ইউরোপে পাওয়া প্রাচীনতম সিংগিং সিকেডাগুলোর মধ্যে অন্যতম। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টের কাছে মেসেল পিট নামক এক প্রাচীন আগ্নেয় হ্রদের খনিতে এই স্ত্রী পোকাটির ফসিল পাওয়া গেছে। এর ডানার নকশা এবং ঠোঁটের মতো মুখাংশ এতটাই সংরক্ষিত ছিল যে, বিজ্ঞানীরা একে সহজেই শ্রেণিবদ্ধ করতে পেরেছেন। তারা এর নাম দিয়েছেন ***Eoplatypleura messelensis***। এই আবিষ্কারে ধারণা করা হচ্ছে, ইউরোপে ঝিঁঝিঁপোকা আরও বহু আগে থেকেই বসবাস করছিল।

সমুদ্রতলের জগত

আটলান্টিক মহাসাগরের দূরবর্তী সাউথ স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের কাছে গভীর সমুদ্রের একটি প্রাণবহুল ইকোসিস্টেম আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে নতুন প্রজাতির সম্ভাবনাসহ প্রবাল, স্পঞ্জ, তারা মাছ ও সামুদ্রিক শামুকসহ নানা জীব পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা একটি রিমোট কন্ট্রোল যান ব্যবহার করে হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের কাছাকাছি এলাকাগুলো ম্যাপ করেছেন ও পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন।

ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

সূর্য বিস্ফোরণ

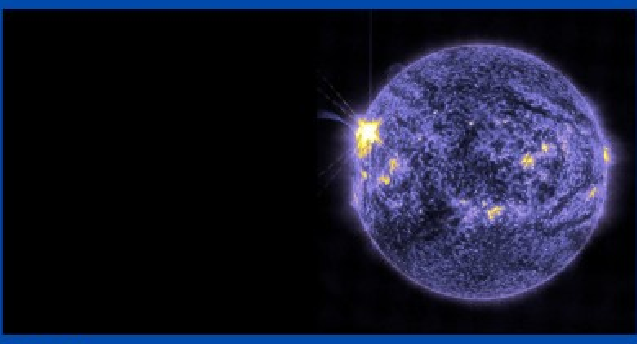

NASA/SDO

১৪ মে, ২০২৫ তারিখে নাসার সোলার ডাইনামিকস অবজারভেটরি থেকে তোলা ছবির বাঁ পাশে দৃশ্যমান একটি বিশাল সোলার ফ্লেয়ার আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় রেডিও সিগন্যাল বন্ধ করে দেয়। সূর্য থেকে নির্গত এমন বিস্ফোরণে বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় বিকিরণ পৃথিবীর ওপরের বায়ুমণ্ডলের কিছু অংশ আয়নিত করে ফেলে, যার ফলে তা রেডিও তরঙ্গ শোষণ বা ছড়িয়ে দেয়, ফলে যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটে। এসব ব্ল্যাকআউট সাধারণত খুব বেশি সময় স্থায়ী হয় না, তবে নেভিগেশন সিস্টেমে প্রভাব ফেলতে পারে।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী

ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা (ESA) এর কোপার্নিকাস সেন্টিনেল-২ স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবিতে কানাডার ম্যানিটোবার ল্যাক ডু বোনে অগ্নিকাণ্ড থেকে উত্থিত ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। এই দাবানলে দুইজন নিহত হন, প্রায় এক হাজার মানুষকে বাড়ি ছাড়তে হয় এবং কিছু এলাকা এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে চেনা যায় না। মে মাসে কানাডায় এ ধরনের একাধিক দাবানলের খবর পাওয়া গেছে, যা আগুনের মৌসুমের শুরু নির্দেশ করে।

Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025

অম্ল পরীক্ষা

গত ১৪ বছর ধরে মোনাকোর সায়েন্টিফিক সেন্টারে গবেষকরা ***Stylophora pistillata*** প্রবাল চাষ করছেন এবং সেগুলোকে অ্যাসিডিক পরিবেশে রাখছেন, যেন ভবিষ্যতের মহাসাগরীয় অম্লতা কী প্রভাব ফেলতে পারে তা বোঝা যায়। কাসিয়া স্ত্রেকের তোলা এই পরীক্ষার ছবি তার “Repairing the Earth” সিরিজের অংশ, যা সাসটেইনেবিলিটি ক্যাটাগরিতে সনি ওয়ার্ল্ড ফটো অ্যাওয়ার্ড জিতেছে। কেন্দ্রের পরিচালক ডেনিস আলেমাঁ বলেন, “তাপপ্রবাহ বা দাবানল হলে মানুষ নিজের চোখে তা দেখতে পায়। কিন্তু প্রবাল বা গর্গোনিয়ানদের মৃত্যু জলে ঘটে, যা শুধু ডাইভারদের চোখেই ধরা পড়ে। তাই সেগুলো বোঝার জন্য আমাদের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে হয়েছে।”

Kasia Strek/Le Monde

গর্তের ভেতর গর্ত

মঙ্গলের জেজেরো ক্রেটারে নাসার পারসেভেরেন্স রোভার ৫ সেন্টিমিটার চওড়া একটি বৃত্তাকার গর্ত তৈরি করেছে। রোভার এই ধরনের গর্ত তৈরি করে পাথরের উপাদান বিশ্লেষণ ও অতীত জীবনের সম্ভাব্য চিহ্ন খোঁজার জন্য। এটি ভবিষ্যতের কোনো মিশনে পৃথিবীতে ফেরানোর জন্য নমুনাও সংগ্রহ করে। রোভারটি এর নিজ হাতে করা কাজের ছবি তুলেছে এর রোবোটিক বাহুর মাথায় লাগানো ক্যামেরা “WATSON” দিয়ে।

NASA/JPL-Caltech

বানর কাণ্ড

পানামার এক গবেষণায় ক্যামেরা ট্র্যাপে দেখা গেছে, যুবক ক্যাপুচিন বানররা (Cebus capucinus imitator) ছোট হাউলার বানরদের (Alouatta palliata coibensis) অপহরণ করছে। গবেষকরা জানিয়েছেন, কেন তারা এটা করে বা অপহৃত বানরদের পরিণতি কী হয়, তা এখনও পরিষ্কার নয়। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট অব অ্যানিমেল বিহেভিয়ারের নৃবিজ্ঞানী মার্গারেট ক্রোফুট বলেন, “আমার এক অংশ আশা করে যে কিছু বানর পালিয়ে তাদের মায়ের কাছে ফিরে গেছে। কিন্তু আমাদের কাছে এর সুনিশ্চিত তথ্য নেই।”

Brendan Barrett/Max Planck Institute of Animal Behaviour

স্নায়ুবিজ্ঞান

মানুষের জিনে ইঁদুরের বড় মস্তিষ্ক

মানুষের একটি বিশেষ জিনের অংশ (HARE5) ইঁদুরের জিনে প্রতিস্থাপন করলে তাদের মস্তিষ্ক ৬.৫% পর্যন্ত বড় হয়। এই অংশটি স্নায়ুকোষ তৈরিতে সহায়তা করে এবং মানুষের মস্তিষ্ক বড় ও জটিল হওয়ার পেছনে এর ভূমিকা থাকতে পারে।

Sergey Bezgodov/Shutterstock

মানুষের জিনের একটি বিশেষ অংশ ইঁদুরের জিনে প্রতিস্থাপন করলে সেই ইঁদুরগুলোর মস্তিষ্ক সাধারণের চেয়ে বড় হয়ে যায় — এমনটাই জানানো হয়েছে গত ১৪ মে, ২০২৫ এ *Nature* জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে।

এই অংশটি এক ধরনের ডিএনএ কোড, যা নির্দিষ্ট কিছু জিনকে সক্রিয় করতে সহায়তা করে। এটি মস্তিষ্কের বাইরের স্তরকে বড় করে তোলে, কারণ এটি সেসব কোষের উৎপাদন বাড়ায় যেগুলো পরে স্নায়ুকোষে রূপান্তরিত হয়। এই আবিষ্কার মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে অন্যান্য প্রাইমেটদের তুলনায় এত বড় হলো, তার একটি আংশিক ব্যাখ্যা দিতে পারে।

সান ফ্রান্সিসকোর গ্ল্যাডস্টোন ইনস্টিটিউট অফ ডেটা সায়েন্স অ্যান্ড বায়োটেকনোলজির বায়োইনফরমেটিক্স গবেষক ক্যাথরিন পোলার্ড বলেন, আগের গবেষণাগুলোর তুলনায় এই গবেষণাটি অনেক গভীরে গিয়ে কাজ করেছে।

মস্তিষ্ক বড় হওয়ার রহস্য

মানুষের মস্তিষ্ক কীভাবে এত বড় ও জটিল হলো, সেটি এখনো রহস্যই রয়ে গেছে বলে জানান বার্সেলোনার হসপিটাল দেল মার মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নিউরোজেনেটিকস গবেষক গ্যাব্রিয়েল সান্টপেরে বারো। "চিম্পাঞ্জিদের থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে আলাদা হওয়ার পর থেকে মানুষের মস্তিষ্ক যেভাবে আকারে তিনগুণ হয়েছে, তার পূর্ণ ব্যাখ্যা আমরা এখনো পাইনি," তিনি বলেন।

আগের কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে Human Accelerated Regions (HARs) নামে পরিচিত কিছু জিনের খণ্ড (যেগুলো স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সংরক্ষিত

থাকলেও মানুষের ক্ষেত্রে দ্রুত বিবর্তিত হয়েছে) মস্তিষ্কের গঠন ও আকারের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে HARs-এর কার্যকারিতা কীভাবে মস্তিষ্ক গঠনে প্রভাব ফেলে, তা এখনো পুরোপুরি বোঝা যায়নি, বলেন এই গবেষণার সহলেখক ও ডিউক ইউনিভার্সিটির বিকাশজনিত স্নায়ুবিজ্ঞানী ডেব্রা সিলভার।

HARs নিয়ে স্পষ্ট ধারণা পেতে সিলভার ও তার সহকর্মীরা একটি নির্দিষ্ট HAR অঞ্চল, HARE5, নিয়ে গবেষণা করেছেন, যা তাঁরা প্রায় এক দশক আগে আবিষ্কার করেছিলেন। ইঁদুরে এই অংশটি Fzd8 নামক একটি জিনের কার্যক্রম বাড়ায়, যা স্নায়ুকোষের বিকাশ ও বৃদ্ধির পেছনে মূল ভূমিকা রাখে। গবেষক দলটি এই HARE5 অংশের প্রভাব মানুষ, চিম্পাঞ্জি ও ইঁদুরের মধ্যে তুলনা করেন।

যখন গবেষকরা ইঁদুরের জিনে তাদের নিজস্ব HARE5 অংশের বদলে মানুষের HARE5 অংশ বসান, তখন দেখা যায় প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় সেই ইঁদুরগুলোর মস্তিষ্ক সাধারণ ইঁদুরের তুলনায় ৬.৫% বড় হয়েছে। এই বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে radial glia নামক স্নায়ু স্টেম সেলে, যেগুলো পরবর্তীতে স্নায়ুকোষ ও অন্যান্য মস্তিষ্ককোষে রূপান্তরিত হয়। মানুষের HARE5 এই কোষগুলোর বিভাজন ও বংশবৃদ্ধি বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে ইঁদুরের HARE5 অংশের তুলনায় বেশি সংখ্যক স্নায়ুকোষ তৈরি হয়।

তবে মস্তিষ্ক বড় হলেও সেই ইঁদুরগুলোর বুদ্ধিমত্তা বা স্মৃতিশক্তি বেড়েছে কিনা, সেটি এখনো পরিষ্কার নয় বলে জানান সিলভার।

ছোট পরিবর্তন, বড় প্রভাব

মানুষের HARE5 অংশ কীভাবে চিম্পাঞ্জিদের অংশ থেকে আলাদা, তা খুঁজতে গিয়ে গবেষকরা চারটি জিনগত পরিবর্তন শনাক্ত করেছেন, যেগুলো প্রত্যেকটিই কোষ বিভাজন বাড়াতে সহায়তা করে — এমনকি চিম্পাঞ্জি ও মানব কোষেও।

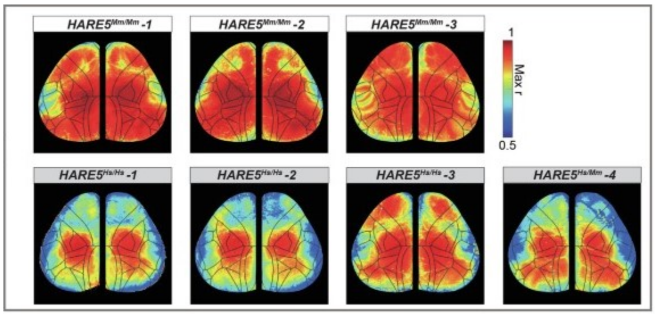

Liu, J. et al./Nature

এরপর তাঁরা ল্যাবরেটরিতে ছোট ছোট থ্রিডি মানব মস্তিষ্কের organoid তৈরি করে পরীক্ষা করেন HARE5 কীভাবে স্নায়ুকোষ তৈরিতে ভূমিকা রাখে। দেখা যায়, চিম্পাঞ্জির HARE5 ব্যবহার করা organoid-এ radial glial কোষ কম তৈরি হয় এবং কোষগুলো কম পরিপক্ক হয়। গবেষকরা আরও দেখেন, HARE5 একটি গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যালিং পাথওয়েকে সক্রিয় করে, যা নিউরাল স্টেম সেলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে — এটি আবার মানুষের মস্তিষ্ক বড় ও জটিল হওয়ার একটি কারণ হতে পারে।

সান্টপেরে বারো বলেন, ভবিষ্যতে আরও গবেষণায় দেখা উচিত যে HARE5-এর প্রভাব অন্যান্য প্রায় ৩,০০০ HARs-এর সাথে কিভাবে মিলেমিশে কাজ করে। "এই HARs এখনো এক বিশাল জিনগত খনির মতো, যা নিয়ে আমাদের আরও গভীরে অনুসন্ধান চালানো দরকার," তিনি বলেন।

সিলভার ও তার দল ইতিমধ্যেই গবেষণা করছেন কীভাবে বিভিন্ন HAR একসাথে কাজ করে। "মানব মস্তিষ্ককে তার বর্তমান রূপে পৌঁছে দিতে অসংখ্য জটিল জিনগত প্রক্রিয়া ভূমিকা রেখেছে," তিনি বলেন।

লেখক: জারা জাইন্ড

রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41586-025-09002-1*

জেনেটিক্স

evoCAST: নতুন যুগের জিন সম্পাদনা পদ্ধতি

একটি নতুন CRISPR-ভিত্তিক প্রযুক্তি, evoCAST, মানব DNA-তে সম্পূর্ণ জিন নির্ভুলভাবে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছে। এতে DNA কাটার দরকার পড়ে না, ফলে এটি নিরাপদ ও কার্যকর জিন থেরাপির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

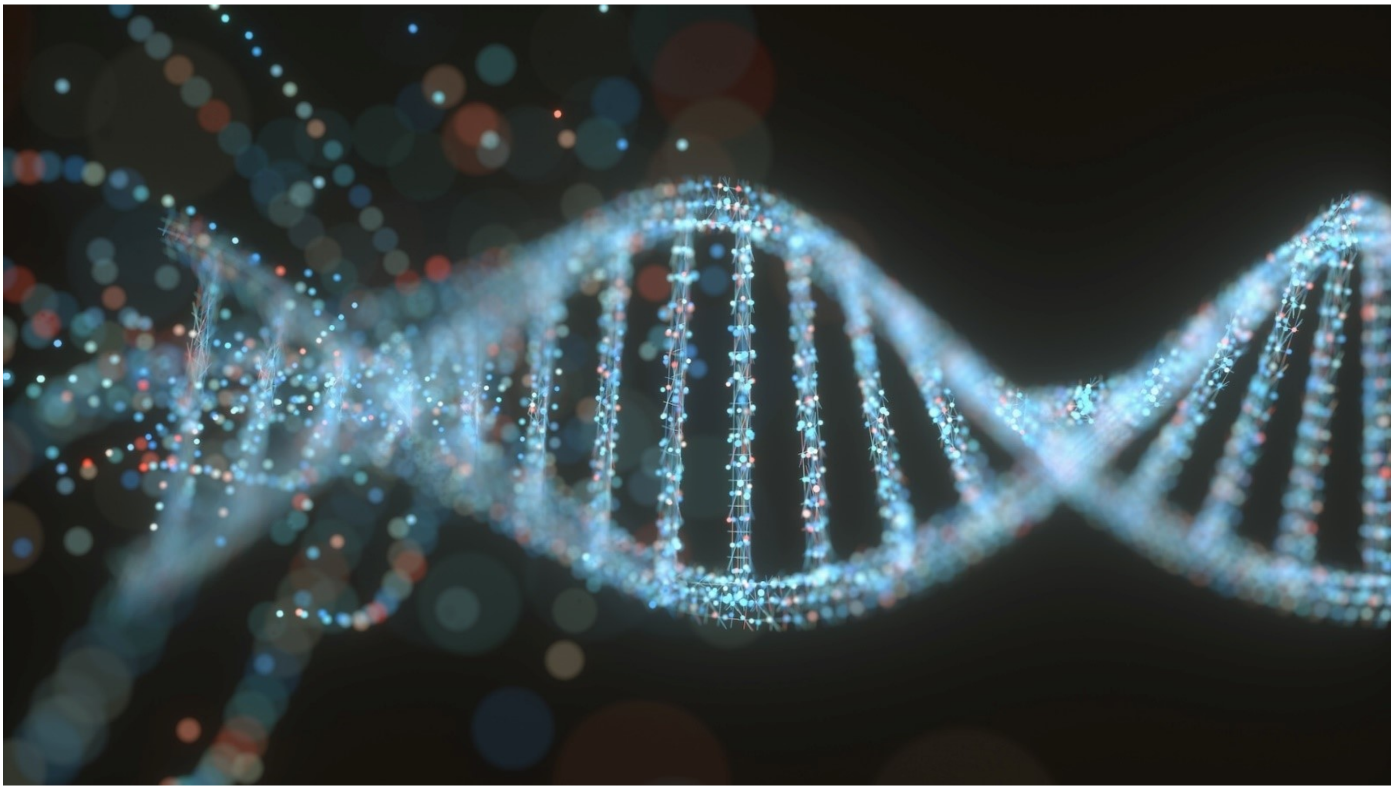

ktsimage/Getty Images

একটি নতুন জিন সম্পাদনার (genome-editing) প্রযুক্তি এমন একটি কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, যার মাধ্যমে পুরো একটি জিনকে নির্ভুলভাবে এবং কার্যকরভাবে মানব DNA-তে প্রবেশ করানো সম্ভব। এই কাজটি মূল CRISPR পদ্ধতিগুলোর পক্ষে অর্জন করা কঠিন ছিল।

গত ১৫ মে, ২০২৫ এ *Science* জার্নালে প্রকাশিত এই পদ্ধতিটি এমন জিন-কারেকশন থেরাপির পথ প্রশস্ত করতে পারে, যা মাত্র একবার দেওয়া হলেই কার্যকর হবে। এটি ক্যানসারের জন্য তৈরি করা কোষভিত্তিক থেরাপিগুলোর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারে এবং গবেষণার জন্য জিনগত মডেল তৈরি করাও সহজ করে তুলতে পারে।

বিশেষ সরবরাহ ব্যবস্থা

সবচেয়ে প্রচলিত জিন-ডেলিভারি (gene delivery) পদ্ধতিগুলোর একটি হলো পরিবর্তিত ভাইরাস ব্যবহার করা, যা কোষের জিনোমে জিনগত উপাদান প্রবেশ করায়। যদিও এটি কার্যকর, কিন্তু ভাইরাসগুলো সাধারণত অনিয়মিতভাবে তাদের উপাদান প্রবেশ করায়, যার ফলে ক্ষতিকর প্রভাব বা জিন প্রকাশের ওপর দুর্বল নিয়ন্ত্রণ দেখা দিতে পারে।

CRISPR পদ্ধতিতে ভাইরাসের তুলনায় নিয়ন্ত্রণ বেশি, কিন্তু এতে DNA কাটতে হয়—যার ফলে অনাকাঙ্ক্ষিত মিউটেশন বা অসম্পূর্ণ জিন মেরামতের ঝুঁকি থাকে। তাছাড়া, প্রতিটি মিউটেশনের জন্য আলাদা টেমপ্লেট ডিজাইন করতে হয়, যা এর পরিসর সীমিত করে দেয়।

নতুন এই প্রযুক্তিটি এই দুটি সমস্যাই এক ধাপে সমাধান করে। এতে DNA কাটতে হয় না বা আলাদা ডিজাইন লাগে না, বরং নির্দিষ্ট স্থানে সম্পূর্ণ জিন প্রবেশ করানো যায়। ডেভিড লিউ, নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যামুয়েল স্টার্নবার্গ এবং তাঁদের সহকর্মীরা এটি তৈরি করেছেন। এটি একটি ব্যাকটেরিয়াল এনজাইম কমপ্লেক্স ব্যবহার করে, যাকে বলে CRISPR-associated transposase বা সংক্ষেপে CAST।

Transposase হলো এমন একটি এনজাইম যা 'জাম্পিং জিন' (jumping genes)–এর গতিশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে। আগে CAST ব্যবস্থাকে ব্যাকটেরিয়ার কোষে বড় আকারের জিনগত অংশ স্থানান্তরের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু মানব ও স্তন্যপায়ী কোষে, এর আগে যত CAST ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর কার্যকারিতা খুব কম ছিল।

এনজাইমের বিবর্তন

এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে লিউ ও স্টার্নবার্গ directed evolution নামের একটি পদ্ধতি ব্যবহার করেন, যেখানে

ল্যাবেই ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। তাঁরা CAST-এর উপাদানগুলোর জিন একটি ব্যাকটেরিয়াভাইরাসে (bacteriophage) স্থাপন করেন। এমনভাবে সেট-আপ করা হয় যে সবচেয়ে কার্যকর CAST সহ ভাইরাসগুলোই সবচেয়ে ভালোভাবে বৃদ্ধি পায়। তারপর তাঁরা বিবর্তনকে নিজের পথে চলতে দেন।

শত শত প্রজন্ম পর এবং কিছু CAST উপাদানের 'rational engineering' করার পর, তাঁরা একটি উন্নত সংস্করণ তৈরি করেন। এতে CAST-এর গঠনকারী পাঁচটি প্রোটিনে মোট ২১টি ছোট পরিবর্তন করা হয়। জাপানের রিকেন ইনস্টিটিউটের বায়োইঞ্জিনিয়ার মাকোতো সাইতো একে "অবিশ্বাস্য রকমের directed evolution" বলে অভিহিত করেন।

এই নতুন কমপ্লেক্সের নাম দেয়া হয়েছে evoCAST। এটি একাধিক জিনোমিক স্থানে সর্বোচ্চ ৩০% দক্ষতায় জিন প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছে যা মূল ভার্সনের চেয়ে ৪০০ গুণ বেশি কার্যকর।

ল্যাব পরীক্ষায় evoCAST সফলভাবে ১০,০০০ নিউক্লিওটাইডেরও বেশি দৈর্ঘ্যের সেগমেন্ট প্রবেশ করিয়েছে, যা একটি পূর্ণ জিন এবং তার নিয়ন্ত্রণ উপাদান বহন করার জন্য যথেষ্ট। এটি বিভিন্ন ধরণের মানব কোষে কাজ করতে সক্ষম। এটি এমন "নিরাপদ অঞ্চল" লক্ষ্য করে যেগুলোতে নতুন DNA প্রবেশ করালে কোষের স্বাভাবিক কাজ বিঘ্নিত হয় না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, evoCAST একটি মাত্র এনজাইম ধাপে এর কাজ করে—কোনো ডাবল-স্ট্র্যান্ড DNA কাটার দরকার হয় না।

CAST-এর নতুন প্রতিযোগীরা

সাম্প্রতিক মাসগুলোতে, আরও কয়েকটি গবেষণা দল নিজেদের Transposon-ভিত্তিক পদ্ধতি নিয়ে এসেছে, যা DNA কাটা ছাড়াই বড় অংশ প্রবেশ করানোর উদ্দেশ্যে তৈরি।

এপ্রিল মাসে, হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের জোনাথান গুটেনবার্গ এবং ওমর আবুদায়েহর নেতৃত্বে একটি দল একটি নতুন পদ্ধতি উপস্থাপন করে। এটি পাখিদের জিনোমে পাওয়া একটি মোবাইল জেনেটিক এলিমেন্টের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তাঁরা এই উপাদানের সংযোজন যন্ত্রাংশকে এমন একটি CRISPR এনজাইমের সঙ্গে যুক্ত করেন, যা DNA লক্ষ্য করে কিন্তু কাটে না—ফলে এটি মানব কোষে জিন-আকারের ইনসার্ট ইনস্টল করতে পারে।

অন্যদিকে, ক্যালিফোর্নিয়ার ইমেরিভিলের বায়োটেক প্রতিষ্ঠান Metagenomi মার্চ মাসে evoCAST-এর অনুরূপ একটি পদ্ধতি প্রকাশ করে, যেখানে আরও সহজ একটি transposase ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও এটি তুলনামূলকভাবে কম দক্ষ, তবে ছোট আকারের জন্য থেরাপিতে ব্যবহার সহজ হতে পারে।

জটিল কিন্তু আশাব্যঞ্জক

তবে নতুন এই প্রযুক্তিগুলোর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েই গেছে। উদাহরণস্বরূপ, evoCAST-এর ক্ষেত্রে গবেষকেরা খুব কম সংখ্যক অনাকাঙ্ক্ষিত ইনসার্ট (off-target) পেলেও, কিছু ভুল স্থানে জিন প্রবেশ করেছে। এছাড়া CAST যন্ত্রপাতির জটিলতা, এর বহুপদ উপাদানের জন্য, প্যাকেজিং ও ডেলিভারিতে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে।

"তারা যতদূর এগিয়েছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়," বলেন টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈবপদার্থবিজ্ঞানী ইলিয়া ফিনকেলস্টেইন। "তবে এটি একটি বেশ জটিল ব্যবস্থা।"

তবু, evoCAST-এর বিকাশ এবং অন্যান্য Transposon-ভিত্তিক পদ্ধতির খোঁজ চালিয়ে যাওয়া প্রমাণ করে যে এই প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে নিরাপদে বড় আকারের জিনগত উপাদান ইনস্টল করার ক্ষেত্রে আমরা মাত্র শুরু করেছি।

"এটাই ইঞ্জিনিয়ারিং এর সৌন্দর্য," বলেন স্টার্নবার্গ। "আমরা এটিকে সবসময় আরও ভালো করতে পারি।"

লেখক: অরুণিমা তানহা

রেফারেন্স: *DOI: 10.1126/science.adt5199*

মহাকাশ

চীনের মহাকাশ স্টেশনে নতুন অণুজীবের সন্ধান!

চীনের তিয়ানগং স্পেস স্টেশনে অবস্থানরত বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি একটি নতুন ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেছেন, যা মহাকাশের কঠিন পরিবেশেও বেঁচে থাকতে সক্ষম। ২০২৩ সালের শেনঝো-১৫ অভিযানে সংগৃহীত নমুনা বিশ্লেষণ করে এই অণুজীবটি শনাক্ত করা হয়। গবেষকরা মনে করছেন, এর জিনগত বৈশিষ্ট্য মহাকাশ কৃষি, জৈবপ্রযুক্তি ও চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

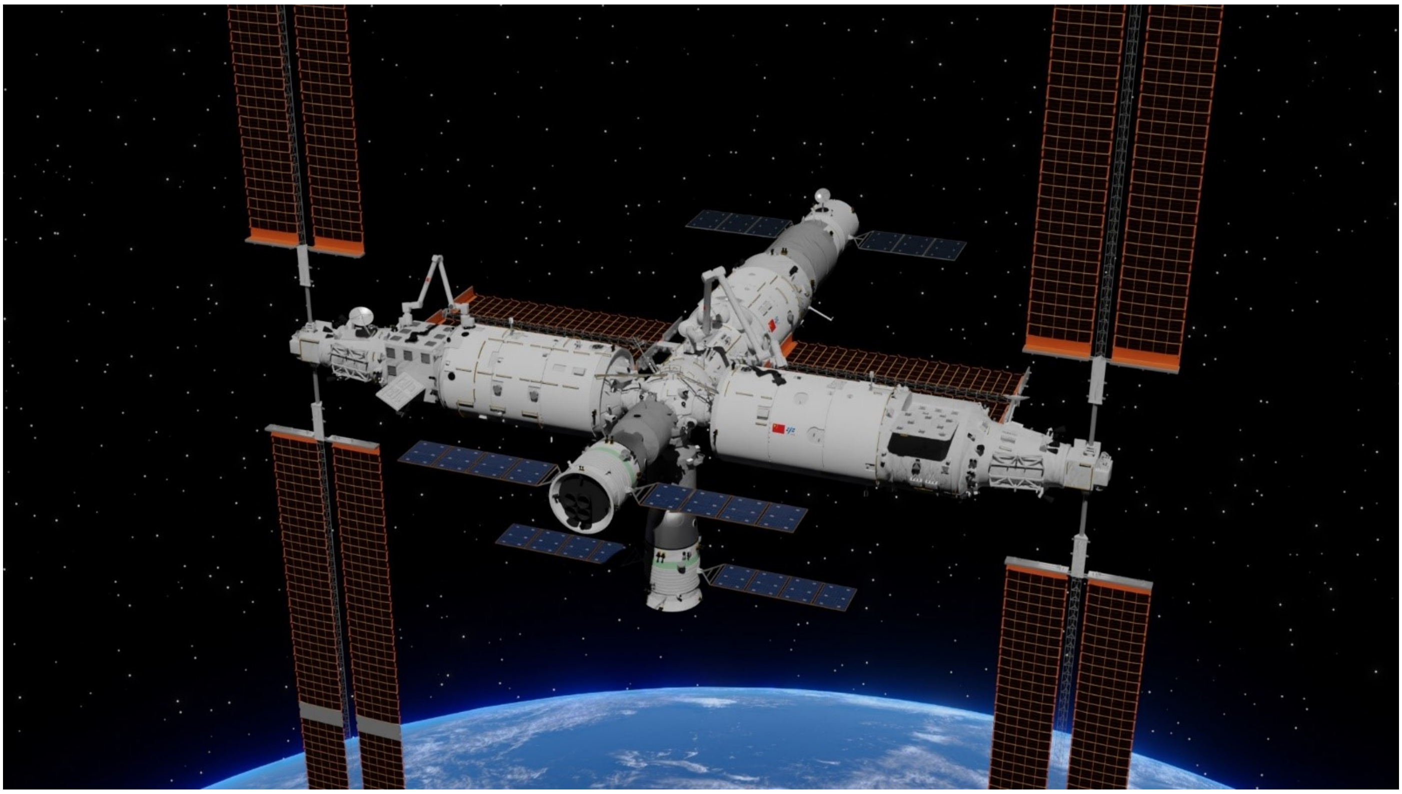

Shujianyang/Wikimedia

মহাকাশে পাঠানো চীনের 'তিয়ানগং' স্পেস স্টেশনে অবস্থানরত বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এমন এক অণুজীব প্রজাতি আবিষ্কার করেছেন, যা পৃথিবীর বাইরের কঠিন ও প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার অভাবনীয় ক্ষমতা রাখে। নতুন আবিষ্কৃত এই ব্যাকটেরিয়ার নাম রাখা হয়েছে *Niallia tiangongensis*।

চীনের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা China Manned Space Agency (CMSA) জানিয়েছে, মহাকাশ অভিযানে জীববৈচিত্র্যের অভিযোজন পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে এই নতুন ব্যাকটেরিয়া বা অণুজীব শনাক্ত করেন বিজ্ঞানীরা। যাকে তারা এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হিসেবে বিবেচনা করছেন।

আসলে গত ২০২৩ সালের মে মাসে শেনঝো-১৫ (Shenzhou-15) মহাকাশ অভিযানে পাঠানো নভোচারীরা তিয়ানগং স্টেশন থেকে বিভিন্ন পরিবেশগত নমুনা সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে সেগুলো বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা অণুজীবটির জিনতাত্ত্বিক গঠন ও প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য যাচাই করে নিশ্চিত হন যে এটি হচ্ছে একটি একেবারে নতুন ব্যাকটেরিয়া প্রজাতি।

বিজ্ঞানীদের মতে, এই অণুজীবটি মহাকাশের মাইক্রোগ্র্যাভিটি, অতিবেগুনি বিকিরণ এবং চরম তাপমাত্রার মতো কঠিন পরিবেশেও সক্রিয়ভাবে বেঁচে থাকতে সক্ষম। এটি প্রাণের অভিযোজন, বিকিরণ সহনশীলতা এবং জীবনের উৎস অনুসন্ধানে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।

চীনা গবেষকরা আশা করছেন, *Niallia tiangongensis* ব্যাকটেরিয়াটির এমন কিছুজিনগত বৈশিষ্ট্য বহন করে, যা মহাকাশ কৃষি, জৈবপ্রযুক্তি ও ভবিষ্যতের মহাকাশ চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, এমন অণুজীবের মাধ্যমে মঙ্গল বা চাঁদের মতো গ্রহে কৃষিজীব ও প্রাকৃতিক সার তৈরির ধারণা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা।

তিয়াংন স্পেস স্টেশনে এই ব্যাকটেরিয়া বা অণুজীব আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, চীন শুধু কক্ষপথে মহাকাশ স্টেশন গড়ে তুলেই থেমে নেই, বরং সেখানে উচ্চমানের মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাও চালিয়ে যাচ্ছে চীন। যার ফলশ্রুতিতে জীববিজ্ঞানে ঘটছে যুগান্তকারী অগ্রগতি এবং নতুন নতুন আবিষ্কার।

পরিশেষে বলা যায় যে, চীনের তিয়ানগং স্টেশনে সংগৃহীত এই জীবাণু-ভিত্তিক গবেষণা ভবিষ্যতে আমাদের পৃথিবীর বাইরের পরিবেশে জীবন ধারণের সম্ভাবনা ও প্রস্তুতির ক্ষেত্রে হয়ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আর এ ধরনের নতুন আবিষ্কার মানবজাতির মহাকাশ অভিযান ও গবেষণার পথে যে বাস্তবসম্মত প্রস্তুতি প্রয়োজন—তার এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

লেখক: সিরাজুর রহমান

রেফারেন্স: *DOI: 10.1099/ijsem.0.006693*

জ্যোতির্বিজ্ঞান

নক্ষত্রের চারপাশে থাকা ডিস্কে বরফের সন্ধান!

বরফ গ্রহ গঠনে, বিশেষ করে বিশাল গ্যাসীয় জয়ান্ট তৈরিতে, বড় ভূমিকা রাখে। ধূমকেতুর মাধ্যমে এই বরফ আবার পাথুরে গ্রহেও পৌঁছাতে পারে। এবার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের নিয়ার-ইনফ্রারেড স্পেক্ট্রোগ্রাফ (NIRSpec) থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা HD 181327 নামের এক ইয়াং, সূর্যের মতো নক্ষত্রের চারপাশে থাকা ধূলিময় ধ্বংসাবশেষ ডিস্কে স্ফটিকাকৃতির বরফের অস্তিত্ব শনাক্ত করেছেন।

NASA/ESA/CSA/STScI/Ralf Crawford

জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ ব্যবহার করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নতুন নক্ষত্র HD 181327-এর চারপাশে থাকা ধ্বংসাবশেষের ডিস্কে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বরফের সন্ধান পেয়েছেন। এই আবিষ্কার প্রাথমিক গ্রহ গঠনের

প্রক্রিয়া এবং বসবাসযোগ্য জগত তৈরির পরিবেশ সম্পর্কে নতুন ধারণা দিয়েছে।

HD 181327 নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে প্রায় ১৬৯ আলোকবর্ষ দূরে পিক্টর নামের নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত। এটি তুলনামূলকভাবে নতুন গ্রহ। এর বয়স প্রায় ২.৩ কোটি বছর এবং এটি আমাদের সূর্যের চেয়ে প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি ভরের। TYC 8765-638-1 এবং WISE J192258.97-543217.8 নামেও এটি পরিচিত। এই নক্ষত্রটি একটি মেইন সিকোয়েন্স নক্ষত্র, যার চারপাশে রয়েছে একটি সক্রিয় ধ্বংসাবশেষপূর্ণ অঞ্চল।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের চেন জি-র নেতৃত্বে একটি গবেষণা দল ওয়েব টেলিস্কোপের নিয়ার-ইনফ্রারেড স্পেক্ট্রোগ্রাফ (NIRSpec) ব্যবহার করে এই নক্ষত্রের বাইরের অংশে থাকা সূক্ষ্ম ধুলিকণাগুলো পর্যবেক্ষণ করে। এই ধুলিকণাগুলো ধ্বংসাবশেষ ডিস্কে ঘন ঘন সংঘর্ষের ফলে তৈরি হয়, যার মধ্যে থাকে ধুলাবালি মিশ্রিত ক্ষুদ্র পানির বরফ টেলিস্কোপ অত্যন্ত দক্ষভাবে শনাক্ত করতে পারে।

ওয়েব-এর পর্যবেক্ষণে নক্ষত্র ও তার চারপাশের ডিস্কের মাঝে একটি পরিষ্কার, ধুলিমুক্ত ফাঁকা অঞ্চল ধরা পড়ে। এই ফাঁকা জায়গার বাইরেই রয়েছে ধ্বংসাবশেষের একটি প্রশস্ত বেল্ট, যা আমাদের সৌরজগতের কুইপার বেল্টের মতোই—যেখানে বরফ ও পাথরের টুকরো, বামন গ্রহ ও ধূমকেতুর মতো বস্তু পাওয়া যায়।

গবেষণার সবচেয়ে চমকপ্রদ আবিষ্কারগুলোর একটি ছিল স্ফটিকাকৃতির পানির বরফের উপস্থিতি—যেটি আমাদের সৌরজগতের শনি গ্রহের বলয় এবং কুইপার বেল্টের বস্তুতেও দেখা যায়। তবে বরফ সিস্টেমে সমানভাবে ছড়িয়ে নেই। ধ্বংসাবশেষের বাইরের অঞ্চলে ২০ শতাংশের বেশি বরফ রয়েছে, মাঝখানের অংশে আছে প্রায় ৮ শতাংশ। কিন্তু তারা থেকে সবচেয়ে কাছের অংশে প্রায় কোনো বরফই পাওয়া যায়নি। গবেষকরা মনে করেন, নক্ষত্র থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মি বরফকে বাষ্পীভূত করে ফেলছে অথবা গ্রহাণু সদৃশ পাথুরে বস্তুগুলো বরফকে নিজেদের ভেতরে আটকে রাখছে, যেগুলো ওয়েব শনাক্ত করতে পারে না।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এমন বরফপূর্ণ বস্তু গ্রহ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এরা শুধু গ্রহের জন্মে সহায়তা করে না, বরং সিস্টেমের ভেতরের অংশে গঠিত শিলা-গ্রহে পানির সরবরাহ করতেও সাহায্য করতে পারে।

এই আবিষ্কার আমাদের বোঝার পথকে আরও সুস্পষ্ট করেছে—জীবনের জন্য অপরিহার্য পানি কীভাবে ইয়াং গ্রহ ব্যবস্থায় ছড়িয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতে কীভাবে তা নবগঠিত পৃথিবীর মতো গ্রহে পৌঁছাতে পারে।

লেখক: ইরতা আমালিয়া

রেফারেন্স: *DOI: 10.1038/s41586-025-08920-4*

জ্যোতির্বিজ্ঞান

সৌরজগতে নতুন বামন গ্রহের সন্ধান

বিজ্ঞানীরা প্লুটোর বহু বাইরে 2017 OF_{201} নামে একটি নতুন বামন গ্রহ আবিষ্কার করেছেন, যার অস্বাভাবিক কক্ষপথ প্ল্যানেট নাইন-এর অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে।

সৌর জগতের বরফ-শীতল ও দূরবর্তী অঞ্চলে, প্লুটোর বহু গণ্ডি পেরিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শনাক্ত করেছেন একটি সম্ভাব্য নতুন বামন গ্রহ।

এর নাম 2017 OF_{201}, যার ব্যাস আনুমানিক ৭০০ কিলোমিটার। এটি বামন গ্রহ হওয়ার মোটামুটি সব যোগ্যতা রাখে। কিন্তু এই আবিষ্কারের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো এর কক্ষপথ, যা ইঙ্গিত দেয় যে বহুল আলোচিত Planet Nine (সৌরজগতের অন্ধকার অঞ্চলে কোনো বিশাল অদৃশ্য গ্রহ) থাকতে নাও পারে।

প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির জ্যোতির্বিজ্ঞানী সিহাও চেং বলেন, "সূর্য থেকে এই বস্তুটি কক্ষপথের সবচেয়ে দূরের বিন্দু (অ্যাফিলিয়ন) তে অবস্থিত যা পৃথিবীর কক্ষপথের তুলনায়

১৬০০ গুণ দূরে। আর থেকে এই বস্তুর সবচেয়ে কাছের বিন্দু (পেরিহেলিয়ন) পৃথিবীর কক্ষপথের ৪৪.৫ গুণ দূরে, যা প্লুটোর কক্ষপথের মতো।”

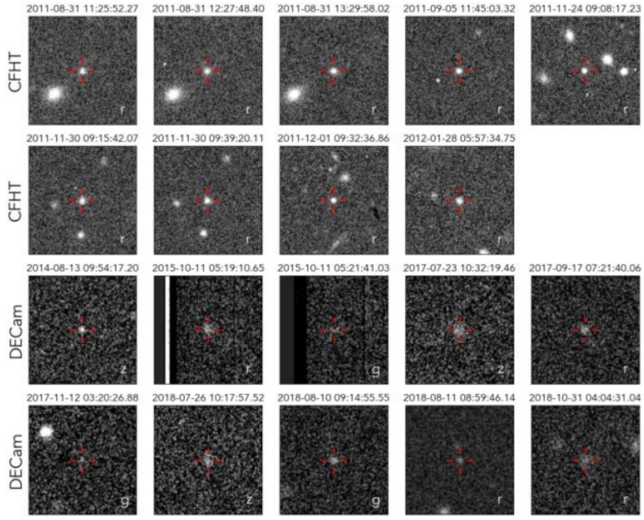

2017 OF201 এর ১৯ টি পর্যবেক্ষণ (Cheng et al.)

চেং এবং তাঁর সহকর্মীরা বহুদিন ধরে সৌরজগতের বাইরের ট্রান্স-নেপ্টুনিয়ান অবজেক্ট (TNO) শনাক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছেন। এই বস্তুগুলো হলো পাথর ও বরফের মিশ্রণে গঠিত, যা নেপচুনের কক্ষপথের বাইরেই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে (প্রায় ৩০ অ্যাস্ট্রোনমিকাল ইউনিট বা AU দূরে; যেখানে ১ AU মানে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যকার দূরত্ব)।

এসব বস্তুকে শনাক্ত করা কঠিন— কারণ এরা আকারে ছোট, অতিরিক্ত ঠান্ডা, এবং সূর্যের আলো খুব কম প্রতিফলিত করে।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আরও উন্নত যন্ত্রপাতি তৈরি হয়েছে যা কুইপার বেল্ট এবং তার বাইরের অঞ্চল পর্যন্ত স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। এ পর্যন্ত সবচেয়ে দূরের শনাক্ত বস্তু হলো FarFarOut, যার আকার প্রায় ৪০০ কিলোমিটার এবং এটি ১৩২ AU দূরে অবস্থিত।

চেং ও তাঁর দল 2017 OF_{201}-কে খুঁজে পান Dark Energy Camera Legacy Survey (DECaLS) এবং Canada France Hawaii Telescope (CFHT) এর আর্কাইভ করা তথ্য বিশ্লেষণ করে। ২০১১ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত DECaLS ও CFHT মোট ১৯ বার বস্তুটি পর্যবেক্ষণ করেছে, যার ভিত্তিতে দলটি নিশ্চিতভাবে এর কক্ষপথ নির্ণয় করতে পেরেছে।

2017 OF201 প্রথম দেখা যায় ৯০.৫ AU দূরে — প্লুটোর গড় দূরত্ব (৪০ AU) থেকে দ্বিগুণেরও বেশি। এর কক্ষপথ একটু বেশিই উপবৃত্তাকার, যা একদিকে ৪৪ AU পর্যন্ত কাছে আসে, অন্যদিকে ১৬০০ AU দূরে চলে যায় — যা Oort Cloud-এর অভ্যন্তরে পড়ে। এই Oort Cloud হলো বরফ ও পাথরের এক বিশাল মেঘ, যা সূর্য পরিবারকে ঘিরে রেখেছে একেবারে প্রান্তসীমায়।

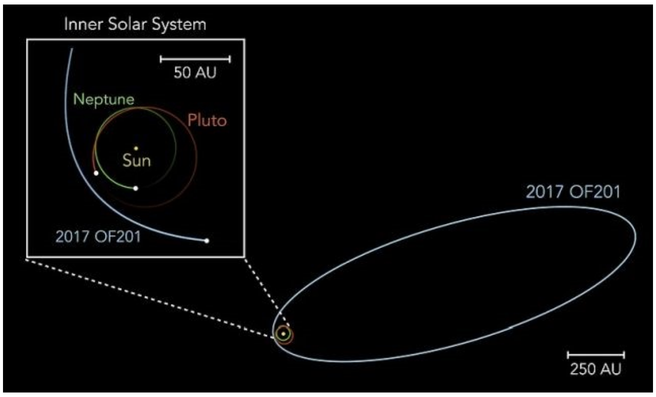

নেপচুন, প্লুটো এবং 2017 OF201 এর কক্ষপথ (Jiaxuan Li/Sihao Cheng)

এই বিশাল কক্ষপথ কীভাবে তৈরি হলো, তা এখনও পরিষ্কার নয়। সম্ভবত কোনো বিশাল বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ টানে এটি ছিটকে গেছে, বা হয়তো এর কক্ষপথ পরিবর্তন একাধিক ধাপে ঘটেছে।

তবে যেটা স্পষ্ট, তা হলো এই কক্ষপথ অন্য TNO-দের মতো নয়, যাদের অবস্থান একধরনের গুচ্ছাকারে ছিল এবং যাদের দেখে কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানী মনে করেছিলেন, কোনো অজানা বড় গ্রহ (Planet Nine) তাদের প্রভাবিত করছে।

চেং এবং তাঁর দল 2017 OF_{201}-এর কক্ষপথ নিয়ে কম্পিউটার সিমুলেশন চালিয়েছেন — একবার Planet Nine ধরে নিয়ে, আরেকবার না ধরে নিয়ে। তারা দেখেছেন, যদি Planet Nine না থাকে, তাহলে 2017 OF_{201} বর্তমানের মতোই স্থায়ীভাবে কক্ষপথে থাকতে পারে। কিন্তু যদি Planet Nine থেকে থাকে, তাহলে নেপচুনের সাথে তার মাধ্যাকর্ষণ পারস্পরিক ক্রিয়ায় ১০ কোটি বছরের মধ্যেই 2017 OF_{201} সৌরজগত থেকে ছিটকে পড়ে যাবে।

এটি Planet Nine-এর অস্তিত্বের বিপক্ষে অন্যতম শক্ত প্রমাণ। একইসঙ্গে এটি ইঙ্গিত দেয়, এরকম আরও বহু বস্তু কুইপার বেল্টে এবং তার বাইরেও আছে — যাদের আমরা এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি।

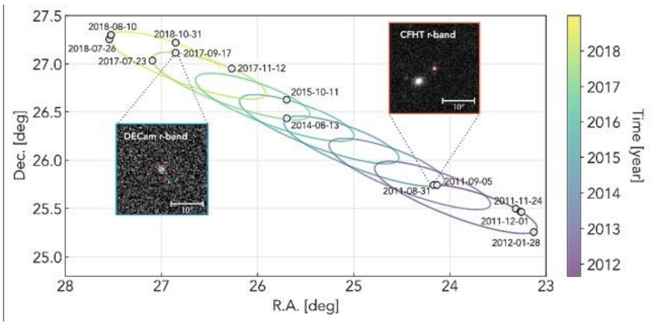

সার্ভের তথ্য থেকে 2017 OF201 এর চিত্র এবং এর গতিপথ (Jiaxuan Li/Sihao Cheng)

চেং বলেন, "2017 OF201 তার কক্ষপথের সময়ের মাত্র এক শতাংশ সময় এতটা কাছে আসে, যাতে আমরা সেটিকে দেখতে পারি। এরকম একটি বস্তু থাকাই ইঙ্গিত দেয়, এর মতো আরও শতাধিক বস্তু থাকতে পারে; তারা এতটাই দূরে যে আমাদের বর্তমান যন্ত্রপাতি দিয়ে ধরা যায় না।"

"যদিও টেলিস্কোপে অগ্রগতির ফলে আমরা মহাবিশ্বের দূরতম অংশেও পৌঁছাতে পারছি, কিন্তু আমাদের নিজেদের সৌরজগৎ নিয়েই এখনো অনেক কিছু জানার বাকি রয়েছে।"

2017 OF201-এর আবিষ্কার International Astronomical Union আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এটি নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে প্রিপ্রিন্ট ওয়েবসাইট arXiv-এ।

লেখক: ইরতা আমালিয়া

রেফারেন্স: *DOI: 10.48550/arXiv.2505.15806*

জ্যোতির্বিজ্ঞান

স্পাইডার পালসার ও তার হিলিয়াম সঙ্গীর রহস্য উদঘাটন

বিশ্বের সবচেয়ে বড় রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহার করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এমন এক বিরল 'স্পাইডার পালসার' আবিষ্কার করেছেন, যা তার সঙ্গী হিলিয়াম তারাটিকে ধ্বংস করছে। এই গবেষণায় প্রথমবারের মতো এক 'কমন এনভেলপ' পর্যায়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলেছে, যা বাইনারি স্টারদের একত্রে মিশে যাওয়ার পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচিত।

PCR B1957+20 'ব্লাক উইডো' পালসার (ডানে) ও এর ব্রাউন ডোয়ার্ফ সঙ্গী তারা (বামে) [Mark A. Garlick/Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysics, University of Toronto]

বিশ্বের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ ব্যবহার করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পরস্পরের চারপাশে ঘুরতে থাকা দুইটি বাইনারি স্টারের বিবর্তনে একটি 'হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্র'-এর ইঙ্গিত পেয়েছেন। এটি এমন একটি স্টার সিস্টেম, যেখানে পালসার নামের একটি দ্রুত ঘূর্ণায়মান নিউট্রন স্টার (একটি বিশাল সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষ) তার বড় সঙ্গী নক্ষত্রের ভেতরে প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে সেটির বাইরের স্তর ছিঁড়ে ফেলে কেবল কেন্দ্রটি রেখে দেয়।

খুঁজে পাওয়া এই নিউট্রন তারাটি একটি বিরল 'স্পাইডার পালসার'-এর উদাহরণ। স্পাইডার পালসার হলো একধরনের নিউট্রন তারা, যা খুব দ্রুত ঘোরে এবং তার সঙ্গী তারাটিকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে ফেলে। এটি হয় আশপাশের পদার্থ শুষে নেয়ার মাধ্যমে করে, অথবা তীব্র রেডিও তরঙ্গ নির্গত করার মাধ্যমে। গত ২২ মে, ২০২৫ তারিখে *Science* জার্নালে প্রকাশিত এই আবিষ্কারটি ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে এমন সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্র্যাভিটেশনাল-ওয়েভ অবজার্ভেটরিতে ধরা পড়া অসাধারণ সংঘর্ষের ঘটনাগুলো ঘটে — যার মধ্যে দুইটি নিউট্রন তারা, দুইটি ব্ল্যাক হোল, কিংবা একটি নিউট্রন তারা ও একটি ব্ল্যাক হোল জড়িত থাকতে পারে।

বেইজিংয়ের ন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অবজারভেটরিজ-এর প্রধান রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিন-লিন হান বলেন যে, এই পালসারটি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কারণ এটি যে রেডিও সংকেত পাঠায় তা থেকে বোঝা যায় যে এটি প্রতি ৩.৫ ঘণ্টায় একবার সঙ্গী তারাকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু এই সময়ের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ সময় সেটি অদৃশ্য থাকে, যা ইঙ্গিত দেয় যে সঙ্গী তারাটি সম্ভবত গ্যালাক্টিক ধূলিকণায় আচ্ছাদিত। যা ইঙ্গিত দেয় এর ধ্বংস হবার প্রক্রিয়াকে।

হান ও তার সহকর্মীরা এই তারাটিকে চার বছর ছয় মাস ধরে বারবার পর্যবেক্ষণ করেন — যার মধ্যে তিনটি দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা সম্পূর্ণ কক্ষপথ পর্যবেক্ষণ করেছিল। তারা দক্ষিণ চীনের গুইঝো প্রদেশে অবস্থিত ফাইভ-হানড্রেড-মিটার অ্যাপারচার স্ফেরিক্যাল রেডিও টেলিস্কোপ (FAST) ব্যবহার করেন — যা এখন পর্যন্ত নির্মিত সবচেয়ে শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপ।

গবেষকেরা হিসাব করে দেখান, সঙ্গী তারাটির ভর সূর্যের চেয়ে ১ থেকে ১.৬ গুণ বেশি — কিন্তু তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এটি একটি সাধারণ তারা হতে পারে না, যেমন আমাদের সূর্য, কারণ এটির কক্ষপথ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যেহেতু পালসারটি মাঝে মাঝে আড়াল হয়ে যায়, তাই সঙ্গী তারা খুব বেশি সঙ্কুচিতও হতে পারে না — অর্থাৎ এটি অন্য কোনো নিউট্রন তারা, ব্ল্যাক হোল বা হোয়াইট ডোয়ার্ফ নয়।

তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সঙ্গী তারাটি একটি হিলিয়াম তারা — যার বাইরের হাইড্রোজেন স্তর ইতোমধ্যেই ছিঁড়ে গেছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে এই ব্যবস্থা একটি 'কমন এনভেলপ' পর্যায় অতিক্রম করেছে: অর্থাৎ সঙ্গী তারাটি বয়সে বৃদ্ধ হয়ে এতটাই ফুলে উঠেছিল যে সেটি নিউট্রন তারাটিকে গ্রাস করে ফেলে। এরপর নিউট্রন তারাটি কয়েক হাজার বছর এই বাইরের স্তরের ভিতরে অবস্থান করে, এবং তার রশ্মির মাধ্যমে সেই স্তরটিকে ধীরে ধীরে মহাকাশে উড়িয়ে দেয়। মনে করা হয় এই ধরনের 'কমন এনভেলপ' পর্যায় বাইনারি স্টারদের কক্ষপথ এতটাই সংকুচিত করে দেয় যে তারা অভিকর্ষীয় তরঙ্গ নির্গত করতে শুরু করে — যা কক্ষপথ আরও সংকুচিত করে, যতক্ষণ না তারা একত্রে মিশে যায়।

'স্পাইডার পালসার'-এর নামকরণ করা হয়েছে স্ত্রী মাকড়সার অনুকরণে, যারা সঙ্গমের পর পুরুষ মাকড়সাকে খেয়ে ফেলে। এই নামগুলো নির্ভর করে সঙ্গী তারাটির ধরনের ওপর — যেমন 'ব্ল্যাক উইডো' বা 'রেডব্যাক'। এটি প্রথম 'স্পাইডার পালসার', যার সঙ্গী একটি হিলিয়াম তারা। "জ্যোতির্বিদদের হয়তো এখন একটি উপযুক্ত নাম খুঁজে পেতে মাকড়সা বিশেষজ্ঞদের (অ্যারাকনোলজিস্ট) শরণাপন্ন হতে হতে পারে," বলেন সেলমা ডে মিনক, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, গারচিং, জার্মানির একজন তাত্ত্বিক জ্যোতির্পদার্থবিদ।

লেখক: তাশফিয়া নুজহাত প্রজ্ঞা

রেফারেন্স: *DOI: 10.1126/science.ado0769*

চিকিৎসাবিজ্ঞান

প্রথম পার্সোনালাইজড CRISPR থেরাপি

জন্মগত একটি জটিল রোগে আক্রান্ত কেজে মালডুন নামের এক শিশু বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি, যার জন্য আলাদাভাবে তৈরি করা হয়েছে একক CRISPR জিন-সম্পাদনার চিকিৎসা। চিকিৎসাটি তার নির্দিষ্ট জেনেটিক সমস্যা ঠিক করতে সাহায্য করেছে, এবং এখন সে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে।

Children's Hospital of Philadelphia

একটি ছোট্ট ছেলের খুব জটিল এক জেনেটিক (জন্মগত) রোগ ছিল, কিন্তু এখন সে সুস্থভাবে বড় হচ্ছে। এই শিশুটি হলো পৃথিবীর প্রথম মানুষ, যার জন্য একেবারে আলাদা করে, শুধুমাত্র তার শরীরের জন্য তৈরি একটি বিশেষ জিন-সম্পাদনার চিকিৎসা (CRISPR) দেওয়া হয়েছে। এই CRISPR থেরাপিটি শুধুমাত্র তার নির্দিষ্ট রোগ-সৃষ্টিকারী জেনেটিক মিউটেশন সংশোধনের জন্য তৈরি।

এই শিশুটির নাম কেজে মালডুন। এখন তার বয়স প্রায় দশ মাস, এবং তার বাবা-মা জানাচ্ছেন, সে ভালো আছে। তার শরীরের প্রোটিন প্রক্রিয়াজাত করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে মিউটেশনের কারণে, সেটি সারানোর জন্য তাকে তিন ডোজ CRISPR থেরাপি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসকেরা এখনই এটাকে সম্পূর্ণ "সুস্থ হয়ে যাওয়া" বলতে নারাজ। তারা বলছেন, এটা এখনো শুরুর দিক, এবং আরও অনেক কিছু শেখার আছে।

এই চিকিৎসা তৈরি করতে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ও সরকারি সংস্থা মাত্র ছয় মাস সময় নিয়েছে। তবে *The New England Journal of Medicine*-এ ১৫ মে, ২০২৫ এ প্রকাশিত গবেষণায় বলা হয়েছে, এই থেরাপিটি কেবল মালডুনের শরীরের জিন অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে, অন্য কারো ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করা যাবে না।

গবেষকেরা আশা করছেন, এই ঘটনা ভবিষ্যতে বিরল জেনেটিক রোগে আক্রান্ত অন্য মানুষদের জন্য নতুন পথ দেখাবে।

CRISPR-ভিত্তিক থেরাপি ইতিমধ্যেই সিকল-সেল অ্যানিমিয়ার মতো জেনেটিক রোগে আক্রান্ত অনেক মানুষের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে সেসব থেরাপি একই ধরনের রোগে অনেক মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, তাদের জেনেটিক পার্থক্য উপেক্ষা করে। কিন্তু মালডুনের ক্ষেত্রে থেরাপিটি তার নির্দিষ্ট জেনেটিক মিউটেশনকে লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে।

মালডুন মা-বাবার কাছ থেকে দুটি ভিন্ন মিউটেশন পেয়েছিল, যার ফলে তার শরীর carbamoyl phosphate synthetase 1 (CPS-1) নামের প্রয়োজনীয় একটি এনজাইম তৈরি করতে পারত না। এতে তার শরীরে প্রোটিন ভাঙার সময় উৎপন্ন হওয়া নাইট্রোজেন যৌগ প্রক্রিয়াজাত করতে সমস্যা হতো। ফলে তার রক্তে অ্যামোনিয়া জমে যেত, যা মস্তিষ্কের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত।

এই রোগের সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হলো লিভার প্রতিস্থাপন, কিন্তু মালডুন তখনো তা নেওয়ার মতো বড় হয়নি। প্রতিদিন তার মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বা মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ছিল। এরকম CPS-1 ঘাটতি জনিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের প্রায় অর্ধেকই লিভার ট্রান্সপ্লান্ট পাওয়ার আগেই মারা যায়।

ড. আর্নস-নিকলাস বাচ্চাটির পরিবারকে অন্য একটি পথের প্রস্তাব দেন। তিনি এবং তার দল CRISPR-এর একটি নতুন কৌশল বেস এডিটিং নিয়ে কাজ করছিলেন, যা ডিএনএর নির্দিষ্ট অংশে একক অক্ষরের পরিবর্তন আনতে পারে। তারা ভাবছিলেন, এবার হয়তো মানুষের ওপর এই কৌশল প্রয়োগের সময় এসেছে।

মালডুনের বাবা-মায়ের সম্মতি নিয়ে গবেষকরা এক বিশাল সহযোগী দল গঠন করেন। তারা দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেরা বেস এডিটিং পদ্ধতি নির্বাচন করেন এবং সেটি ইঁদুর ও বানরের ওপর পরীক্ষা করেন। বিভিন্ন কোম্পানি তাদের প্রযুক্তিগত সাহায্য ও উপাদান দিয়ে সহায়তা করে। মার্কিন FDA এই চিকিৎসার মূল্যায়ন দ্রুত সম্পন্ন করে অনুমোদন দেয়।

মাত্র ছয় মাসেই মালডুন প্রথম ডোজ পায়—যা চিকিৎসকদের মতে একটি বড় সাফল্য। প্রথম ডোজের পর কেজ বয়স অনুযায়ী প্রোটিন খেতে পারছিল, তবে অ্যামোনিয়ার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ওষুধ দরকার ছিল। দ্বিতীয় ডোজের পর ওষুধ পরিমাণ কিছুটা কমানো হয়, কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ করা হয়নি।

এরপর কেজ তৃতীয় এবং শেষ ডোজ পায়। এখন তার ডাক্তাররা ধীরে ধীরে ওষুধ কমাচ্ছেন।

এই পদ্ধতি ভবিষ্যতে আরও বিরল রোগের চিকিৎসায় কিভাবে ব্যবহারযোগ্য হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ জিন থেরাপি এমনকি শত শত মানুষের জন্য তৈরি হলেও, খরচ অত্যন্ত বেশি। আবার এটার সহজ কোনো সমাধানও নেই।

তবে কেজের বাবা-মায়ের জন্য তার বাচ্চা এই চিকিৎসার প্রতিটি অগ্রগতি একেকটা ছোট্ট অলৌকিক ঘটনা। কিছুদিন আগে কেজের মা দেখেন, তার বাচ্চা নিজে নিজে খাটে বসে আছে। তিনি আবেগভরে বলেন, "আমরা কখনো ভাবিনি এমন কিছু দেখতে পাব।"

লেখক: জান্নাতুল মাইশা
রেফারেন্স: DOI: 10.1056/NEJMoa2504747

পৃথিবীর কক্ষপথে কয়টি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রদক্ষিণ করছে?

NASA

একসময়, যখন স্পেস এইজ বা মহাকাশ যুগ সবে শুরু হয়েছিল, পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছিল হাতে গোনা কয়েকটা স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ। আর এখন, মাত্র ৭০ বছরের ব্যবধানে, হাজার হাজার উপগ্রহ পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে — আর প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন উপগ্রহ মহাকাশে ছোড়া হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হলো, ঠিক কতগুলো কৃত্রিম উপগ্রহ এখন পৃথিবীর কক্ষপথে আছে? ভবিষ্যতে আর কতগুলো যোগ হতে পারে? আর এত এত উপগ্রহ একসঙ্গে থাকলে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে?

অনেক দশক ধরে প্রতি বছর মহাকাশে যত উপগ্রহ পাঠানো হতো, সেই সংখ্যাটা বেশ স্থিরই ছিল। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের তৈরি বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'স্পুটনিক' মহাকাশে পাঠানোর পর থেকে প্রতি বছর গড়ে ৫০ থেকে ১০০টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হতো। এই ধারা চলেছে ২০১০ সালের কাছাকাছি পর্যন্ত। এরপর যখন স্পেসএক্স-এর মতো বেসরকারি মহাকাশ কোম্পানিগুলো সক্রিয় হতে শুরু করে, তখন থেকেই উৎক্ষেপণের সংখ্যা বাড়তে থাকে। The Space Report এর প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সালে গড়ে প্রতি ৩৪ ঘণ্টায় একটি রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে, যা দিয়ে মোট ২,৮০০-এর বেশি কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে পাঠানো হয়েছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে পাঠানোর এই দ্রুতগতিতে বৃদ্ধির পেছনে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথমত, এখন মহাকাশে উপগ্রহ পাঠানো আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ ২০২৫ এর ১৪ জানুয়ারি ইউটিউবার মার্ক রোবার তার স্পেস সেলফি প্রজেক্টের স্যাটেলাইট SAT GUS* উৎক্ষেপন করে স্পেসএক্সের ফ্যালকন ৯ রকেটের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় কারণ হলো, এখন রকেট আগের চেয়ে সহজে এবং সস্তায় অনেক বেশি সংখ্যক কৃত্রিম উপগ্রহ বহন করতে পারে। এই বৃদ্ধি রকেটের শক্তি বেড়ে যাওয়ার কারণে নয়; বরং এর পেছনে মূল ভূমিকা রেখেছে ইলেকট্রনিক্স বিপ্লব, যার ফলে উপগ্রহগুলো আকারে অনেক ছোট হয়ে গেছে। ২০২০ সালে উৎক্ষেপণ করা সব মহাকাশযানের মধ্যে ৯৪ শতাংশই ছিল স্মলস্যাট – অর্থাৎ এমন উপগ্রহ যাদের ওজন প্রায় ৬০০ কেজিরও কম।

২০২৫ সালের মে মাস পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী, প্রায় ১১,৭০০টি সক্রিয় উপগ্রহ পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে। এর বেশিরভাগই পৃথিবীর খুব কাছের 'লো-আর্থ অরবিটে'

(LEO) — মানে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ২,০০০ কিলোমিটারের মধ্যে। এই তথ্য দিয়েছেন হার্ভার্ড-স্মিথসোনিয়ান সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোনাথন ম্যাকডাওয়েল, যিনি ১৯৮৯ সাল থেকে উপগ্রহের গতিবিধি নজরদারি করছেন।

তবে সব উপগ্রহই যে এখন কাজ করছে এমন নয়। অনেক উপগ্রহ ইতিমধ্যেই অকেজো হয়ে গেছে, কিছু এখনো কক্ষপথে পড়ে আছে, কিছু আবার সরিয়ে "গ্রেভইয়ার্ড অরবিটে" পাঠানো হয়েছে। জাতিসংঘের মহাকাশ বিষয়ক দপ্তর United Nations' Office for Outer Space Affairs-এর তথ্য অনুযায়ী, সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় মিলিয়ে উপগ্রহের সংখ্যা হতে পারে প্রায় ১৪,৯০০টি — যদিও এটা ঠিকভাবে গণনা করা কঠিন।

এটাই কেবল শুরু। অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, ভবিষ্যতে সক্রিয় উপগ্রহের সংখ্যা ১০ গুণ পর্যন্ত বাড়তে পারে। আর তা হলে জ্যোতির্বিজ্ঞান, মহাকাশ অনুসন্ধান ও পরিবেশের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।

ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী অ্যারন বোলি বলেন, "এত উপগ্রহ থাকার ফলে মহাকাশে ট্রাফিকের সমস্যা তৈরি হচ্ছে, মহাকাশে আবর্জনার পরিমাণ বাড়ছে, জ্যোতির্বিজ্ঞান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, আর রকেট উৎক্ষেপণ ও পুনঃপ্রবেশের সময় বায়ুমণ্ডলে দূষণ ছড়াচ্ছে। এই প্রভাব কতটা মারাত্মক হতে পারে, সেটা আমরা এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি।"

Edwin Aguirre/University of Massachusetts Lowell

উপগ্রহের এই বৃদ্ধির বিস্ফোরন মূলত বেসরকারি কোম্পানিগুলোর তৈরি "মেগাকনস্টেলেশন" বা বিশাল উপগ্রহ ঝাঁকের কারণে। যেমন স্পেসএক্স-এর "স্টারলিংক" প্রকল্প, যা সারা পৃথিবীতে ইন্টারনেট পরিষেবা দিতে তৈরি করা হচ্ছে।

২০২৫ সালের মে মাস পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর কক্ষপথে রয়েছে প্রায় ৭,৪০০টি সক্রিয় স্টারলিংক উপগ্রহ — যা মোট সক্রিয় উপগ্রহের ৬০ শতাংশের বেশি। এই সবকটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে ২০১৯ সালের মে মাসের পর থেকে।

স্পেসএক্স এই দৌড়ে সবার আগে থাকলেও, পিছিয়ে নেই অন্যরা। ইউরোপের ইউটেলস্যাট-এর "ওয়ানওয়েব", AST-এর "স্পেসমোবাইল", অ্যামাজনের "প্রজেক্ট কুইপার" এবং চীনের "থাউজেন্ড সেলস" এর মতো প্রকল্পগুলোও বেশ ভালোমতোই চলছে।

সঠিকভাবে অনুমান করা কঠিন যে, কতগুলো উপগ্রহ ভবিষ্যতে উৎক্ষেপণ হবে। তবে বিজ্ঞানীরা অনুমান করতে পারেন, পৃথিবীর কক্ষপথে নিরাপদে সর্বোচ্চ কতগুলো উপগ্রহ থাকতে পারে। এটাকে বলা হয় "ক্যারিং ক্যাপাসিটি" বা ধারণক্ষমতা।

ম্যাকডাওয়েল, বোলি এবং আরও কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে, লো-আর্থ অরবিটের সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা প্রায় ১,০০,০০০ সক্রিয় উপগ্রহ হতে পারে। এরপর নতুন উপগ্রহ উৎক্ষেপণ হলে, তা শুধু পুরনো ও অকেজো উপগ্রহের জায়গা নেবে।

এই সীমা কখন পৌঁছাবে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে বর্তমান হারে যদি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ চলতে থাকে, তাহলে ২০৫০ সালের আগেই এই সীমায় পৌঁছে যেতে পারে।

এত উপগ্রহ পৃথিবীর চারপাশে ঘোরাফেরা করলে একাধিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। একটি বড় সমস্যা হলো "স্পেস জাঙ্ক" বা মহাকাশে আবর্জনা। অনেক রকেট আংশিকভাবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য হলেও, লো-আর্থ অরবিটে পড়ে থাকা রকেটের বুস্টারগুলো বছরের পর বছর ধরে ঘুরে বেড়াতে পারে। যদি এসব আবর্জনা একে অপরের সাথে বা কোনো উপগ্রহ বা মহাকাশ স্টেশনের সঙ্গে ধাক্কা খায়, তাহলে হাজার হাজার ছোট টুকরো তৈরি হতে পারে — যা ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা তৈরি করে।

এই সমস্যাকে বিজ্ঞানীরা বলেন “কেসলার সিনড্রোম” — যেখানে একটার পর একটা ধাক্কায় এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, যাতে লো-আর্থ অরবিট পুরোপুরি ব্যবহার অযোগ্য হয়ে যায়।

উপগ্রহগুলো পৃথিবীর দিকে আলো প্রতিফলিত করে, যা জ্যোতির্বিদদের জন্য বড় সমস্যা তৈরি করে। অনেক সময় দূরবর্তী মহাজাগতিক বস্তু দেখার সময়, উপগ্রহের আলো টেলিস্কোপের ছবিতে লম্বা রেখা তৈরি করে দেয়।

আরেকটি সমস্যা হচ্ছে “রেডিও দূষণ”। যেমন, স্টারলিংক উপগ্রহ থেকে নির্গত বিকিরণ রেডিও টেলিস্কোপে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। যদি ভবিষ্যতে উপগ্রহের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যায়, তাহলে কিছু ধরনের রেডিও সংকেত সংশ্লিষ্ট গবেষণা একেবারেই সম্ভব হবে না।

রকেট উৎক্ষেপণের সময় বায়ুমণ্ডলে অনেক পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস ছড়ায়, যা জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। একটা রকেট উৎক্ষেপণে যত কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয়, তা গড়ে একটি যাত্রীবাহী বিমানের ১০ গুণের মতো।

আরো একটি আশঙ্কাজনক বিষয় হলো, যখন পুরনো উপগ্রহগুলো বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পুড়ে যায়, তখন সেগুলো অনেক পরিমাণে ধাতব কণা বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। কিছু গবেষক বলছেন, যদি এভাবে প্রচুর উপগ্রহ পুড়ে যায়, তাহলে তা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে পারে — যার ফলাফল হতে পারে ভয়াবহ।

“সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় মিলিয়ে উপগ্রহের সংখ্যা হতে পারে প্রায় ১৪,৯০০টি”

হ্যাঁ, এসব বেসরকারি উপগ্রহ দিয়ে বিশ্বের দূরবর্তী বা সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে ইন্টারনেট পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু অনেক বিশেষজ্ঞ প্রশ্ন তুলছেন — এই উপকারগুলো কি ভবিষ্যতের ভয়াবহ ঝুঁকির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত যে, এখনই আমাদের উৎক্ষেপণের গতি কমিয়ে, পুরো পরিস্থিতি ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করা উচিত।

অ্যারন বোলি বলেন, “উপগ্রহ উৎক্ষেপণ পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে যতক্ষণ না পর্যন্ত আন্তর্জাতিকভাবে ভালো কোনো নিয়ম-কানুন তৈরি হচ্ছে, ততক্ষণ ধীর গতিতে এগোনোটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।”

লেখক: তানভীর রানা রাব্বি

বাংলাদেশ

কাপ্তাই হ্রদে নতুন প্রজাতির আইড় মাছ

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা কাপ্তাই হ্রদে প্রথমবারের মতো Sperata aorella নামক এক প্রজাতির আইড় মাছের সন্ধান পেয়েছেন, যা পূর্বের পরিচিত আইড় প্রজাতি থেকে গঠন ও জিনগত দিক দিয়ে ভিন্ন। এই আবিষ্কার দেশের মৎস্য গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

কাপ্তাই হ্রদে পাওয়া Sperata aorella [Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)]

গত ২৭ মে, ২০২৫ তারিখে রাঙামাটি জেলায় অবস্থিত কাপ্তাই হ্রদে প্রথমবারের মতো একটি নতুন প্রজাতির আইড় মাছের সন্ধান পেয়েছেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), নদী উপকেন্দ্র, রাঙামাটির বিজ্ঞানীরা। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন প্রতিষ্ঠানটির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. ইশতিয়াক হায়দার।

তিনি জানান, গবেষণার অংশ হিসেবে আইড় মাছের বাহ্যিক গঠন ও অন্যান্য শারীরিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তারা দেখতে পান, এ মাছটি পূর্বে পরিচিত *Sperata aor* (তল্লা আইড়) ও *Sperata seenghala* (গুজি আইড়) প্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পরবর্তী কৌলিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে মাছটির ডিএনএ নমুনার সঙ্গে *Sperata aorella* নামক প্রজাতির আইড় মাছের জিনোমের শতভাগ মিল পাওয়া যায়। এই *Sperata aorella* মাছটি আগে কখনও কাপ্তাই হ্রদে চিহ্নিত হয় নি, এবারই প্রথম।

Sperata aorella নামের এ নতুন প্রজাতিটি তুলনামূলকভাবে ছোট আকৃতির। এদের ওজন ১ থেকে ১.৫ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাছটির দেহ লম্বা ও সরু, পৃষ্ঠদেশ ধূসর, পেটের দিক সাদাটে এবং দেহের পাশ রুপালি বর্ণের। মাথা থেকে পৃষ্ঠ পাখনার উৎপত্তি পর্যন্ত অংশটি সমান ঢালু, এডিপোজ ফিন পৃষ্ঠীয় পাখনার সমান দৈর্ঘ্যের এবং খাটো। এছাড়া, মাছটির ম্যাক্সিলারি বারবেল প্রায় পুচ্ছ পাখনা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং চোয়াল গুজি আইড়-র মতো ছাঁটা আকারের।

গঠনগত দিক দিয়ে এর অক্সিপিটাল স্পাইন দীর্ঘ এবং এপিনিউরাল শিল্ড সরু। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি *Sperata aor* এবং *Sperata seenghala* থেকে পৃথক একটি স্বতন্ত্র প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

উল্লেখ্য, *Sperata aor* ও *Sperata seenghala* আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ (IUCN)-এর ২০১৫ সালের তালিকায় বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হলেও, নব আবিষ্কৃত *Sperata aorella* এখনো সেই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়।

গবেষণা কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিয়েছেন বিএফআরআইয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আজহার আলী ও ড. মো. রবিউল আউয়াল হোসেন। গবেষক দলে আরও ছিলেন ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. ইশতিয়াক হায়দার ও বি. এম. শাহিনুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. খালেদ রহমান, রাবিনা আক্তার লিমা, মো. ইমদাদুল হক এবং মো. লিপন মিয়া।

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. ইশতিয়াক হায়দার বলেন, “নদী উপকেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে *Sperata aor* এবং *Sperata seenghala* থেকে ভিন্ন নতুন এক প্রজাতির আইড় মাছ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন। এটি দেশের মৎস্য গবেষণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।”

লেখক: পুষ্পিতা আনোয়ার

সোশ্যাল মিডিয়াতে বিজ্ঞানবার্তা

@bigganbartafb @bigganbarta @bigganbarta @bigganbarta

বিজ্ঞানবার্তা
bigganbarta.org